ইন্দুভূষণ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত।

সন ১৩০৪ সাল।

মূল্য ১৷০ সিকা।

Printed by E. W[illegible]STER, at the ANGLO INDIAN PRESS,
[illegible], Bancharam Ukoor's Lane Calcutta.

বিবেক ও বৈরাগ্য।

ভক্তি-উপহার।

গুরুদেব!

আপনারই দত্ত উপদেশ প্রসূনচয়ে আপনারই চরণ-যুগল পূজা করিলাম। ভক্ত্যুপহার গ্রহণ করুণ।

বেহালা, } চরণাবনত সেবক
সন ১৩০৪ সাল। } শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়।

আমার-আমি।

দ্বিতীয় চিত্র।

বিবেক ও বৈরাগ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইন্দুভূষণ, ধনী কৃতবিদ্য ও ক্ষমতাশালী। ইন্দুভূষণ প্রবল জমিদার ও গবর্ণমেণ্টের নিকট রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার পিতৃপুরুষ বঙ্গে ইংরেজাধিকার সময়ে অনেক সাহায্য কবিয়াছিলেন সেই জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার বংশাবলী বহু সমাদৃত। দুবাচার মুসলমানের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যখন কতিপয় প্রধান বঙ্গ হিন্দুসন্তান সমবেত হইয়া গূঢ় মন্ত্রণা করেন, ইন্দুভূষণের পূর্ব্বপুরুষ তাহাব মধ্যে একজন প্রধান মন্ত্রণাকারী ছিলেন। রাণী ভবানী যখন ইংরেজের বঙ্গাধিকার ঘোররূপে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন "ম্লেচ্ছের বিনিময়ে ম্লেচ্ছ অধিকার" সেই সময় ইন্দুভূষণের পিতৃপুরুষ একা একসহস্র হইয়া রাণী ভবানীর কথার প্রতিবাদ করিয়া নিজমত প্রবল করেন। সেই অবধি তাঁহার বংশাবলী রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া ইংরেজরাজের নিকট বহু সম্মা[illegible]ইয়া আসিতেছেন। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার একজন পুরাতন জমি[illegible]র ছিলেন। কুলপরিবর্ত্তিনী ভাগিরথী কাল ধর্ম্মে

মুর্শিদাবাদস্থ তাঁহার বৃহদট্টালিকার অধিকাংশ আত্মসাৎ করিয়াছেন। এখনো ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। ইন্দুভূষণের পিতা মুর্শিদাবাদ জেলায় স্থানান্তরে নিজ বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া যান। সেই অবধি তাঁহার বংশপরম্পরা সেই স্থানেই বাস করিয়া আসিতেছেন। ইন্দুভূষণ সেই বংশেরই ধুরন্ধর। তিনি অগাধ ধনের ধনপতি স্বয়ংই প্রভূত ধন-সম্পত্তির মালিক। অল্প বয়সে ইন্দুভূষণ বাবু পিতৃহীনহন, সুতরাং অন্য অভিভাবক অভাবে নিজ সংসারে তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। ইন্দুভূষণ যখন পিতৃহীন হন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশবর্ষ মাত্র, সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। ইন্দুভূষণ দেখিতে অতি সুপুরুষ, গঠন অতি সুন্দর। সুগৌর কান্তিতে সুকোমল নবোদ্গতশ্মশ্রুরাজিতে মুখমণ্ডল সুশোভিত হইয়া নবীন পত্র শোভিত পাদপের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ইন্দুভূষণ নাতি দীর্ঘ, নাতি খর্ব্ব। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুগোল এবং দেহ বলিষ্ঠ। একমাত্র যৌবনই মানবের বিষম কাল, যে কারণে যৌবনে মানবের অ[illegible] সম্ভবনা, তাহা তাঁহার সকলই থাকিয়াও চঞ্চল তুফানে স্থিরমতি নাবিকের ন্যায় ইন্দুভূষণ সংসার তরীখানি সুন্দর ও স্থির ভাবে চালাইতেছেন। যাঁহার মতি স্থির তাঁহার কার্য্যকলাপ ও স্থির। তাই আজ পিতৃহীন অতুলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ইন্দুভূষণ, যৌবন মদে মাতেন নাই, তাই দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণকে সবশে রাখিয়া রাজর্ষি জনকের ন্যায় প্রজা পালন ও রাজ্য শাসন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ইন্দুভূষণ ষোড়ষ বৎসর বয়সে পরিণীত হইয়াছেন। সেই পবিত্র পরিণয়ের দুইটী মাত্র সুফল ফলিয়াছে। একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইন্দুভূষণ প্রকৃতিগত ঘোর সংসারী না হইয়াও সংসার বন্ধনের নিয়মানুরোধে সংসারী হইয়াছিলেন, সুতরাং বৈষয়িক কার্য্যে সদাই নির্লিপ্ত ভাবে বিব্রত থাকিতেন। কিসে সম্পত্তির আয় বৃদ্ধি হইবে, কিসে ধন আরও বর্দ্ধিত হইবে তাহার জন্য সততই ব্যস্তছিলেন, সুতরাং তিনি অল্পকালই শ্রম বিরহিত থাকিতেন। অকিঞ্চিৎকর অ[illegible] কখন কালাতিপাত করিতেন [illegible] মানসিক শ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইলে ব্যায়ামাদি দ্বারা

সে ক্লেশ আশু উপশমিত হইত। কখন কখন ভাগিরথীতীরস্থ বিচিত্র হর্ম্ম্যাদিশোভিত লতামণ্ডপভূষিত নানাবিধ কুসুম বৃক্ষ সুশোভিত প্রমোদোদ্যানে বিহার করিয়া, জাহ্নবী-হিল্লোলসম্পৃক্ত সুস্নিগ্ধ মন্দ সমীরণ সেবনে কঠিন মানসিক শ্রমের লাঘব বোধ করিতেন। ভাগ্য ক্রমে ইন্দুভূষণের ভার্য্যা ষোড়ষী বালিকা হইলে ও পাকা গৃহিণী। নাম হিন্দোল-লতা। ইন্দুভূষণ তাঁহাকে আদর করিয়া "হিঁদ্‌লি" বলিয়া ডাকিতেন। পরিজনেরা বউরাণী বলিয়া ডাকিত। হিন্দোললতা সতী সাধ্বী পতিব্রতা, সততই ধর্ম্মানুরতা, প্রাত্যাহিক সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া, দেবতা ব্রাহ্মণের পূজা না করিরা, বাটীতে অভ্যাগত ব্যক্তির আতিথ্য সৎকার না করিয়া আহার করেন না। দিনান্তে সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সমাধানান্তে, স্বামীত্যক্ত অন্ন ব্যঞ্জনাদি আহার করিয়া আপনাকে কৃতার্থস্মন্য জ্ঞান করিতেন। বয়সে বালিকা হইলে কি হয়! হিন্দোলা সর্ব্বগুণে গুণবতী। হিন্দোলা দীনের মা বাপ ছিলেন। যে সমস্ত অভুর নিঃসহায় ব্যক্তি বড়লোকের বাটী প্রবেশে অসমর্থ হইয়া অন্দরবাটীর বহির্দ্দেশে উদয়াস্ত দণ্ডায়মান থাকিত, হিন্দোলা কাহাকেও অর্থ, কাহাকেও বস্ত্র, কাহাকেও অন্নদানে পরিতৃপ্ত করিতেন! তাই তারা তাঁহারই প্রত্যাশায় প্রাচীরের বাহিরে তাঁহারই অপেক্ষা করিত।

হিন্দোলা রূপে গুণে সমান। হিন্দোলা রূপসী, চম্পক বরণা, তন্বঙ্গী, আপাদ-বিস্তারিত-চারুকেশা ও শুভ্রদশনা। হিন্দোলার সৌন্দর্য্য-কিরণে ইন্দুভূষণ মুগ্ধ বটে, কিন্তু পতঙ্গবৎ যৌবন-বহ্নিতে ঝাঁপ দেন নাই—আত্মহারা হন নাই—বিবেক হারান নাই; মতি স্থির রাখিয়া চঞ্চল যৌবন-তরী ধীরে বাহিয়া, ইন্দুভূষণ হিন্দোলা রজ্জুতে আপন যৌবন-তরী বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন—আর তুফানের ভয় নাই—বিপদে ধৈর্য্য ধরিতে শিখিয়াছেন। ইন্দুভূষণ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে জানেন—অনাসক্ত ভাবে বিষয় ভোগ করিতে শিখিয়াছেন। ইন্দুভূষণ জানেন ভোগে রোগ ভয় আছে, মানে চ্যুতি ভয় আছে, ধনে চৌর্য্য ভয় আছে, তিনি জানেন জগতের সকল ভোগ্য বস্তুই ভয়প্রদ, কিন্তু এক মাত্র বৈরাগ্যপথে কোন ভয়ই নাই। তাই ইন্দুভূষণ ভোগ মধ্যে থাকিয়াও

ভোগে অনাসক্ত, কিন্তু শিক্ষাভাবে ক্রিয়া বর্জ্জিত। ক্রিয়াশূন্য বিজ্ঞান সম, বারি শূন্য মেঘ সম, নীরস তরুবর সম, ইন্দুভূষণ জ্ঞানী এবং বিবেকবান হইয়াও বৈরাগ্য পথাবলম্বী হইতে পারেন নাই।

একদা ইন্দুভূষণ মুর্শিদাবাদস্থ তাঁহার কোন এক প্রমোদ কাননে বিহার করিতেছেন। বীণ মৃদঙ্গ ও এসরাজে গুণীগণ তান দিতেছে। কানন সে মনোহর গীতবাদ্যে মাতিয়া উঠিয়াছে। সপ্তস্বরে কলকণ্ঠে কোন কমনীয় কামিনী গীত ধরিয়াছে। সকলেই গীত বাদ্যে বিমুগ্ধ। কামিনীর কোমল কণ্ঠ বিনিঃসৃত স্বরলয় পঞ্চমে উঠিয়া সপ্তমে মিশিতেছে—জাহ্নবী-বারি সে স্বর ধরিয়া লইতেছে—আবার অতিদূরে প্রতিধ্বনি করিয়া সে স্বর ছাড়িয়া দিতেছে। ক্রমে দূরদূরান্তরে সে বাদ্যগীতধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে। শ্রোতাগণ রমণীগণের রূপলাবণ্য-সমন্বিত হাব ভাবে ও মনোহর গীতে বিমুগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ইন্দুভূষণ উন্মত্ত নহেন—বিমুগ্ধ নহেন। ক্ষণকাল কক্ষ মধ্যে থাকিয়া বারাণ্ডায় আসিলেন, কক্ষমধ্যে গীত থামে নাই, এখনও গীত বাদ্য চলিতেছে। নির্জ্জনতা তাঁহাকে বড় ভাল লাগে। তাই অধিকক্ষণ ইন্দুভূষণ কক্ষ মধ্যে থাকিতে পারিলেন না, তাই সহসা বারাণ্ডায় আসিলেন। সঙ্গীত আর তাঁহার ভাল লাগিল না—সঙ্গীতে আর আশা মেটে না। চিত্ত চঞ্চল হইলে এক বিষয় অধিকক্ষণ স্বভাবতই ভাল লাগে না—সদাই যেন হৃদয় অপারতৃপ্ত—সদাই যেন মন চঞ্চল—যেন কি প্রাণের জিনিষ কোথাও খুঁজিয়া মিলিতেছে না—সংসারে যেন সে জিনিষ মেলে না—সে যেন কি অমূল্য জিনিষ—যেন প্রাণের জিনিষ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিষ নয়। কৈ! তবে দর্শনলোভনীয় পদার্থে নয়ন কেন তৃপ্ত হয় না? শ্রবণ সুখকর বিষয়ে কর্ণকুহর কেন পরিতৃপ্ত নহে? কৈ! কিছুতেই তো ইন্দুভূষণের তৃপ্তি নাই? তবে কি অপরিতৃপ্ত ইন্দুভূষণ অসন্তুষ্ট? না! না! ইন্দুভূষণ মায়িক বিষয়লোভে লালায়িত নহে, অতি দুর্লভ ব্রহ্মলাভ-তৃষ্ণায় তৃষিত। ইন্দুভূষণ কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া স্বভাবের শোভা দেখিতে লাগিলেন। বারাণ্ডার নিম্নে একটী প্রশস্ত সরসী; সুন্দর শ্বেতলাল কুমুদ, কহ্লার, প্রস্ফুটিত হইয়া সরসীর

শোভা বিস্তার করিয়াছে। এখনও সন্ধ্যা হয় নাই। সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন, মলয় সমীরণ মৃদু মন্দ বিচরণ করিতেছে। দূরে একটী বৃহৎ তিন্তিলী বৃক্ষে পাপিয়া ঝঙ্কার দিল—তাহার সাড়া পাইয়া চূতমুকুলে অঙ্গ আবরিত করিয়া কোকিল পঞ্চম স্বরে প্রাণের আবেগে গীত ধরিল, গৃহস্থের অঙ্গনাগণ অঙ্কে কলস লইয়া বাপী উদ্দেশে জল আনয়নার্থ্য আসিতেছিল, কোন বিরহ বিধুরা যুবতীর কক্ষস্থ কলস ভূমে পড়িয়া গেল—কাহারও পতি বিদেশস্থ, তাহার স্বামীর কথা মনে পড়িয়া গেল—অমনি পদস্খলন হইয়া হস্তস্থ কলস সোপান মার্গে পতিত হইয়া গড়াইতে গড়াইতে ক্রমাধঃ সোপানাবতরণে বাপীজলে জলোচ্ছাস শব্দে নিক্ষিপ্ত হইল। রমণীগণের এই অবস্থা দেখিয়া কোন প্রবীনা বলিতেছে, "কোকিলটা সময় পাইয়া বড়ই বাদ সাধিল"। ইন্দুভূষণ সে কথা শুনিয়া হাসিলেন। তিনি রমণীগণের অবস্থা স্বচক্ষে সকলি দেখিলেন। সেই বাপীতীরে বহু রজকের আবাস কোন রজক তাহার পত্নীকে কহিতেছে "ধোপানি! দিন্‌তো আবের হয়া বাস্‌নামে আগ্‌ লাগাও।" ইন্দুভূষণ শুনিলেন ইতর শ্রেণীর লোক কহিতেছে "দিন শেষ হইয়াছে"! তিনি ও কাতরভাবে কহিলেন। রজকের দিন ফুরায়, আমার কি ফুরাইবেনা? সংসার লীলায় মত্ত বলিয়া, অতুলৈশ্বর্য্যভোগী বলিয়া আমার দিনের কি শেষ নাই—ভোগের অন্ত নাই? রজকের বৈরাগ্যোদয় হইয়াছে, রজক বহির্ম্মল ধৌত করে, আজ তার কি অন্তর্ম্মল বিধৌত করিতে প্রবৃত্তি জন্মিল? বাস্তবিক সে কি বাসনায় আগুন লাগাইয়া স্বীয় ধর্ম্মপত্নীকে আপনার বাসনায় আগুন লাগাইতে কহিতেছে?" হরি হরি! রজকের কথায় ইন্দুভূষণের চটক ভাঙ্গিল, ইন্দুভূষণ ও রজকের কথার অনুসরণ করিতে প্রস্তুত। তাঁহারও বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে—তাঁহার ও সংসার লীলা ফুরাইয়াছে। নীচবংশোদ্ভব হইয়া ও রজক মহাঋষি—মহাসাধু। "ধন্য! রজক তোমায় ধন্য!" ইন্দুভূষণ জন্মেরমত গৃহত্যাগী হইলেন—সংসার ত্যাগী হইলেন—বিপুলঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিলেন,—প্রাণের পত্নী হিন্দোলাকে ত্যাগ করিয়া চলিলেন।

ইন্দুভূষণ হিন্দোলাকে মায়ার পুত্তলি দেখিলেন—পুত্র কন্যাকে মায়ার পুত্তলি দেখিলেন—অতুল ঐশ্বর্য্য মায়ার খেলা দেখিলেন! ইন্দুভূষণের চক্ষে আজ জগৎ মায়াময় বোধ হইল, সকলই ধোঁকার টাটি জানিলেন। সংসার অসীম মরুভূমি জ্ঞান হইল। মরু মাঝে যেরূপ অসহ্য তৃষ্ণা আসে, ইন্দভূষণ ও আজ সংসার মাঝে অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণায় অধীর। তাই আজসকল ছাড়িয়া সন্নাসী হইয়া,পথের ভিখারী ইন্দুভূষণের হৃদয়ের তৃষ্ণা, প্রাণের অধৈর্য্য. কিয়ৎ পরিমাণে উপশমিত হইল। ইন্দুভূষণ ধীরে ধীরে বারাণ্ডা হইতে সোপানের দিকে আসিলেন, আস্তে আস্তে সোপানাবতরণ করিয়া আস্তে আস্তে উদ্যান বাটীকা উত্তীর্ণ হইয়া রাজপথ ধরিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে চলিলেন। গভীর রাত্রে নিস্বম্বল ইন্দুভূষণ রাজপথ ধরিয়া একাই চলিলেন,রাত্রি প্রভাতহইয়াছে; তথাপি ইন্দুভূষণ চলিতেছেন, এখনও বিশ্রাম নাই। যে কিছু বহু মূল্য উত্তরীয় বস্ত্র ছিল, দিবা-ভাগে পথি মধ্যে অনাথ ব্যক্তিগণকে তাহা বিতরণ করিয়া এক মাত্র পরিধেয় বস্ত্র লইয়া ইন্দুভূষণ চলিলেন। প্রথম দিন কাটিয়া গেল তাঁহার পানাহারের চেষ্টা নাই তথন ও ইন্দুভূষণ চলিতেছেন, ক্রমে রাত্রিও কাটিয়া গেল। বিশ্রামের আবশ্যক হইল না। বৈরাগ্যোদয়ে সংসার তাঁহার পক্ষে তৃণবৎ বোধ হইয়াছে, স্নানাহার বিরামাদি স্বভাবত আবশ্যক হইলে করিবেন, স্থতরাং তাহার জন্য ব্যগ্র নহেন! কতক্ষণে শ্রীবৃন্দাবন পৌঁছিবেন, কতক্ষণে গোবিন্দ জীউ দর্শন করিয়া মায়াময়দেহকে পরিতৃপ্ত করিবেন, মানব জন্ম সার্থক্ করিবেন, সেই পিপাসাই ইন্দুভূষণের বলবতী, তাই এক মনে এক ধ্যানে চলিয়াছেন। পরদিন প্রভাত চলিয়া গেল, মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। সূর্য্যদেব আকাশের মধ্য স্থানে উঠিয়া প্রখর কিরণ বিতরণ করিতেছেন। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে দিঙ্মণ্ডল জ্বলিতেছে, পথের বালুকারাশি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, কাহার সাধ্য রিক্ত পদে সেই উত্তপ্ত বালুকারাশি পার হয়? সেই মধ্যাহ্ন কালে ইন্দুভূষণ নলহাটী পঁহুছিলেন। নলহাটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত মালায় বেষ্টিত। মধ্য বিন্ধ গিরি ভারতের মাণদণ্ড স্বরূপ সমগ্র ভারতকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া উন্নত মস্তকে সূর্য্যের গতি রোধ করিয়া সুদূর বিস্তারিত দেহে

উভয় প্রান্তে উভয় সমুদ্র অবগাহন করিতেছে। সেই বিন্ধ্যগিরিশ্রেণী বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া ভারতের বহু দূরদূরান্তর স্থানে গমন করিয়াছে। নলহাটীস্থ ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা সেই বিন্ধ্যগিরিশ্রেণীর প্রশাখা মাত্র। সতীঅঙ্গ পতনে নলহাটী পবিত্র পীঠ স্থান। দুর্গম অরণ্য মধ্যে গিরি শ্রেণীর উপত্যকায় সতী-অঙ্গ পতিত হয়। লোকালয় শূন্য দুর্গম অরণ্য বলিয়া অধিক যাত্রী এ পুণ্য তীর্থে সচরাচর আসে না; আসিলেও দিবাভাগে তীর্থ দর্শন করিয়াই রাত্রে যাত্রীগণ চলিয়া যায়। এই নিবিড় অরণ্যানি হিংস্র ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি জন্তুগণের আবাস। তীর্থে, রাত্রে বাস করিতে হয় বলিয়া মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী ও উদাসী ব্যক্তিগণ এই পীঠ স্থানে ধূনি জ্বালাইয়া রাত্রি যাপন করে। নলহাটীতে কোন দেবীমূর্ত্তি নাই, মন্দির মধ্যে কেবল মাত্র একটী সুড়ঙ্গের ন্যায় ছিদ্র আছে, সময়ে সময়ে তন্মধ্যে হইতে বায়ু নির্গমন শব্দ হয়। ঐ ছিদ্র, সতীকণ্ঠনালী বলিয়া পুরাণে কথিত। ঐ ছিদ্রস্থান মর্ম্মর প্রস্তরে আবৃত। কিম্বদন্তি আছে, পূজা কালীন পীঠদেবী জাগ্রত হন, সেই সময় ঐ কণ্ঠনালী হইতে শ্বাস প্রশ্বাস বহির্গত হইয়া থাকে। ভূগর্ভ হইতে বায়ু সমুত্থিত হইলেও শ্বাস বায়ু বশতঃ তাহা উত্তপ্ত বলিয়া অনুভূত হয়। আদ্যাশক্তির কি অদ্ভুত শক্তি মহিমা! কি বিচিত্র লীলা! পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ দেবতার ক্রীড়াভূমি, অদ্ভুত শক্তির বিকাশ স্থান। লাবণ্য লীলাময়ী আদ্যাশক্তি, বহুস্থানে বহুপ্রকারে লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার লীলায় অবিশ্বাসের কিছুই নাই। বদ্ধজীব মায়া বশতঃ প্রকৃত শক্তি লীলায় যতই অবিশ্বাস করিবে, সর্পে রজ্জুজ্ঞানের ন্যায় ততই প্রকৃত বিষয়কে অপ্রকৃত বলিয়া তাহার জ্ঞান হইবে। ততই মায়া তাহাকে ঘোর মায়ায় বিজড়িত করিয়া জগৎ মায়াময় করিয়া তুলিবে। তাই বলিতেছি এই সামান্য লীলা অবিশ্বাসের যোগ্য নহে। যাঁহার শক্তিতে প্রভাকর প্রভাত সময়ে প্রাচিদিকে উদিত হইয়া জগদান্ধকার বিদূরিত করিয়া প্রতীচিগগণে অপরাহ্নে অস্তমিতহন, যাঁহার শক্তিতে নিশাকর সুনীর্ম্মল গগণে তারকারাজীসহ সমুদিত হইয়া সুস্নিগ্ধ কিরণে জগদুদ্ভাষিত করিয়া

নিশান্তে গগণগায় মিলাইয়া যায়। যাঁর শক্তিতে অর্ণববারি যথা নিয়মানুক্রমে স্ফীত হইয়া নদনদী প্লাবিত করে। যার শক্তিতে গিরিশৃঙ্গবিদীর্ণ হইয়া অনল ও ধূমরাশি সমুদ্গীরিত হয়। যার শক্তি অবলম্বনে সামান্য বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপাদিত হইয়া বৃহদকাণ্ডপাদপে বৃদ্ধি পাইয়া ফল পুষ্পে জীবগণকে পরিতুষ্ট করে। যাঁর রসময়ী লীলায় মুগ্ধ হইয়া দারাপত্য লইয়া মানবগণ-জীবন-রঙ্গ-ভূমে ক্রীড়া করিয়া মানব লীলা সম্বরণ করেন। তাঁর অপার শক্তির কাছে কোন কার্য্য অসম্ভব? তাইবলি ক্ষুদ্রজীব লীলাময়ীর লীলা কি বুঝিবে? উপত্যকাস্থ পীঠাধিষ্ঠাত্রীদেবী ললাটেশ্বরী বলিয়া খ্যাতা। ললাটেশ্বরীর মন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত, সম্মুখে প্রশস্ত নাটমন্দির ও পার্শ্বে অতিথিগণের বাসোপযোগী গৃহশ্রেণী। সেই সমগ্র দেবালয় প্রাচীরে বেষ্টিত, সম্মুখে এক বিস্তৃত দীর্ঘিকা। প্রসিদ্ধদানশীলা বদান্যাগ্রগণ্যা নাটোররাজ্ঞী রাণী ভবানীর বহু কীর্ত্তি মধ্যে ললাটেশ্বরীর উন্নত-মন্দির ও তৎসংলগ্ন অতিথি-শালা একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ। মন্দিরের সন্নিকটে মানবের আবাস কিম্বা বাজার হাট নাই। দেবালয়ের দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন হইলে দূর হইতে আনাইয়া দেবালয়ের তত্বাবধারক সঞ্চিত করিয়া রাখেন। অতিথি অভ্যাগত এবং সন্ন্যাসী উদাসীন যতই আসুক ও যতদিন থাকুক, কাহাকেও নিরাহারে থাকিতে হয় না, যে ব্যক্তির যাহা অভিরুচি সে তাহাই প্রাপ্ত হয়। কেহ ডাল রুটী খাইতেছে, কেহ ললাটেশ্বরীর প্রসাদ লুচি খাইতেছে, কেহ মিষ্টান্ন খাইতেছে, এবং দিবাভাগে দেবীর ভোগের সময় গ্রাম হইতে দরিদ্র ব্যক্তিগণ আসিয়া উদর পুর্ণ করিয়া ভোগাবশিষ্ট অন্ন ব্যাঞ্জনাদি আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে। সন্ন্যাসীগণ কেহ ভাঙ খাইতেছে, কেহ গাঁজায় দম দিতেছে, কেহ কেবল কলিকার সাহায্যে তাম্রকূটদগ্ধ ধূমপান করিতেছে। যেখানে শক্তি সেইখানেই শিবলিঙ্গ। দেবীর মন্দিরের ঈশান কোনে উন্মত্তভৈরব প্রতিষ্ঠিত।

আজ কয়েক বৎসর হইল এক সিদ্ধ পুরুষ সেই দেব মন্দিরে বাস করিতেছেন। বয়স দেড়শত বৎসরের অধিক হইবে, পলাশির যুদ্ধ সময়ে

এই দেব মন্দিরে তিনি সাধনা করিতেন। তখন তাঁহার বয়ক্রম প্রায় বিংশবর্ষ মাত্র ছিল। স্বয়ং রাণী-ভবানীকে তিনি দেখিয়াছেন। তাঁহার আকার দীর্ঘ, বাহু আজানু-লম্বিত, দেহ নাতি স্থূল নাতি কৃশ, এবং গৌর কান্তি। মাংস্ম গলিত হয় নাই. শুভ্র-দশন পঙ্‌ক্তিও গলিত হয়নাই, কেবল মস্তকে বেণীবদ্ধ শুভ্র জটাভার এবং আবক্ষবিস্তারিত শুভ্র শ্মশ্রু-রাজীতে বয়স অধিক হইয়াছে বলিয়া অনুমান হইত। তিনি পূর্ব্বে স্বেচ্ছাক্রমে ললাটেশ্বরীর পূজা করিতেন, কখন কখন স্বয়ং দেবীরআরতিও করিতেন. সে আরতি যে দেখিয়াছে সে আর ভুলিবে না, আরতিকালীন সম্মুখে যেন এক বিচিত্রদেবী মূর্ত্তি আবির্ভূত হইত। আরতি সহসা থামিত না, কোন কোন সময়ে দুইঘণ্টা কাল ধরিয়া আরতি হইত। সাধু জ্ঞান হারাইয়া আরতি করিতেন। কিন্তু এক্ষণে বহুদিন হইল, আর দেবসেবা করেন না, সদাই মুখে মা মা শব্দ। মা শব্দ সাধু এরূপ সরল ভাবে উচ্চারণ করিতেন যেন বালক মাকে সম্মুখে দেখিয়া আদর করিয়া মা বলিয়া ডাকিতেছে। সাধু সেই দেব মন্দিরের বহির্দ্দেশে একটী প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন। দেবালয়ে তাঁহার অতি সমাদরছিল, দেবালয়ের পরিচারক ও তত্ত্বাবধারক তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া ততোধিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও পূজা করিত। বাস্তবিক সেই সাধুপুরুষ পূজারই যোগ্যপাত্র। তাঁহার নাম বনমালী। কেহ কেহ বনমালী স্বামী, কেহবা শুধু স্বামী মহাশয় বলিয়া ডাকিত। প্রবাদ আছে, যে রাত্রে বনমালী ভূমিষ্ঠ হইলেন, সে রাত্রে আকাশে দুন্দুভিধ্বনি হইয়াছিল, এবং ভূমিষ্ঠ বালকের গলদেশে কে যেন এক ছড়া বনফুলের মালা পরাইয়া দিয়াছিল। সে দিব্য বনফুলের মালা কেহ কখন দেখে নাই, তেমন মালাগাঁথা ও কেহ কখন গাঁথিতে জানে না। তাই তাঁহার জনক-জননী সদ্য-প্রসূত বালকের নাম বনমালী রাখিলেন, তদবধি প্রতিবেশী সকলে তাঁহাকে বনমালী বলিয়া ডাকিত। সে বনফুল-মালা স্বামী মহাশয় আজীবন ত্যাগ করেননাই, মালা বহুদিনের হইলেও বিশীর্ণ হয় নাই। পূর্ণ-ব্রহ্ম-ভগবান-শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ-পক্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ দেহধারী হইয়াছিলেন বনমালী

জ্যোৎস্নাময়ী বাসন্ত-রজনীতে জন্মলাভ করিয়া গৌর বরণ হইয়াছিলেন। মায়া ত্যাগ তাঁহার সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। কথিত আছে কৌমার্য্যাবস্থা হইতেই বনমালী সাধক বলিয়া পরিচিত হন। অল্পকাল মধ্যে বনমালী তন্ত্র সাধনায় এক প্রকার সিদ্ধ হইয়াছিলেন। বিষ্ঠাচন্দনে তাঁহার সমজ্ঞান হইয়াছিল। কয়েক বৎসরে এরূপ হইয়া উঠিলেন যে, কেহ বস্ত্র পরাইয়া দিলে তবে বস্ত্র পরিতেন, মুখে অন্ন তুলিয়া দিলে ভক্ষণ করিতেন। বনমালী সকাম কর্ম্মী বা ফলাকাঙ্খী হইয়া ধর্ম্ম সাধনা করেন নাই। তাই তাঁহার সাধনায়, বৈগুন্যাদি দোষ সঞ্জাত হইয়া সাধনার বিঘ্নোৎপাদন করিতে পারে নাই। ফলপ্রত্যাশী না হইয়া নিষ্কামভাবে শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত অর্পণ করিয়া সাধনকর্ম্মারম্ভ করিয়া, দয়াময়ের দয়ায় অতি সত্বর ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন। তিনি বিবেকবান হইয়া সদসৎ বিচার পূর্ব্বক মায়িক দেহকে শোনিতমাংসমেধাস্থির সমষ্টি মাত্র জানিয়া, দেহান্তর্ভূত ইন্দ্রিয়গণের দৌরাত্মে বশীভূত না হইয়া, প্রশান্ত ভাবে তাহা সহ্য করিতেন। প্রগাঢ় বিবেকের সঙ্গে সঙ্গে সাংখ্যোক্ত তত্ত্বজ্ঞান উপজিত হইলে প্রতি নিয়ত ব্রহ্ম সাগরেই জীবাত্মাকে নিমগ্ন রাখিতেন। তজ্জন্য সে সময় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইত। আত্মারাম পূর্ণব্রহ্মানন্দ বনমালীস্বামী জগৎ ময় ব্রহ্ম দর্শন করিতেন। তাই সে সময় যে সকল উদাসীন ললাটেশ্বরী দর্শন করিতে আসিত তাহারা তাঁহাকে পরমহংস বলিয়া অভিহিত করিত। কোথা হইতে এক ভৈরবী ললাটেশ্বরীর-দেবালয়ে আসিয়া কয়েক মাস বাস করিয়াছিলেন, সেই ভৈরবী বনমালীকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি তাহাকে ক্রিয়াবান করিয়া দিয়া পরমপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার সোপান পরিষ্কার করিয়া দিয়া যান। লোকে বলে স্বয়ং ললাটেশ্বরী নাকি বনমালীর ভক্তিযোগে ও কাতর ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে স্বরূপ দেখাইয়া, ভৈরবী-বেশে তাঁহার সহচরী হইয়া, তন্ত্রোক্তক্রিয়ামতে সমস্ত সাধন-প্রথা শিক্ষা দেন। ভৈরবীর সহিত বনমালী এই সময় মধ্য ভারতে গিয়া তন্ত্র-বিহিত কার্য্য শিক্ষা করেন।

তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া মতে সমস্ত সাধনা শেষ করিয়া, শেষে সন্ন্যাসাবলম্বনে পরম-যোগ-প্রাপ্ত সমাধি লাভ করিতে কৃতনিষ্ঠ হইলেন। ম্লেচ্ছের দৌরাত্মে পাছে সাধনার ব্যাঘাত হয় সেই জন্য বনমালী বহুদূরে নির্জ্জন প্রদেশে তপস্যামানসে গমন করিলেন। মধ্যভারতে স্বামী মহাশয় তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া, উত্তর ভারতে বৈদিক উপাসনার চরম সীমায় উপনিত হইয়া, হিমগিরি শিখরে গভীর যোগমগ্ন রহিলেন। পরিশেষে বহুদিনপরে তাঁহার বাল্য সাধনার স্থান বলিয়া, আবার শেষাবস্থায় ললাটেশ্বরী দর্শন জন্য নলহাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইন্দুভূষণ পূর্ব্বে কখন নলাটেশ্বরীর দেবালয় দর্শন করেন নাই। গিরি উপত্যকায় উন্নত দেবমন্দির দর্শনে তাঁহার ভক্তির উদ্রেক হইল। ভাগ্যক্রমে দেবীসন্দর্শন সুযোগ সমুপস্থিত হওয়ায়, নলাটেশ্বরী দর্শন না করিয়া যাইবেন না। স্থির করিয়া গিরি উপত্যকা আরোহণ করিয়া দেবালয় সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

পরমহংস বনমালী স্বামী।

আজ ইন্দুভূষণ নলহাটী পৌঁছিয়া দেবালয়প্রবেশকালীন সেই বালকবৎ সরল সাধু সন্দর্শন করিয়া গলিয়া যান। সে সময় স্বামীমহাশয় তানপুরা যোগে ব্রহ্মসঙ্গীতে বিভোর ছিলেন। একে তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হইয়াছে

তাহাতে পীঠস্থানে বালকবৎ সাধুদর্শন সংঘটীত হইল। ইন্দুভূষণ পথ-ক্লান্তি ভুলিলেন, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিলেন, ললাটেশ্বরী দর্শন করিতে ভুলিলেন। সাধুর বালকভাব-পূর্ণ-মুখ-মণ্ডল দেখিয়া সকল ভুলিয়া, অধৌতপদে তাঁহারই চরণপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন।

ইন্দুভূষণ বৈরাগী, অতুলৈশ্বর্য্যত্যাগী, প্রাণের পুত্তলি হিন্দোলাত্যাগী, প্রানসম প্রিয়তম শিশু-পুত্রকন্যা-ত্যাগী। পরমহংস বনমালীস্বামীর সহিত প্রথম আলাপ তাঁহার বড়ই ভাল লাগিল। ইন্দুভূষণকে দেখিযাই পরমহংস বলিলেন "কি বাবা। বড় তৃষ্ণা! সেই তৃষ্ণা নিবারণের জন্যই মা তোমায় এখানে এনেছেন।" অধীর ইন্দুভূষণ কাতর ভাবে কহিলেন "গুরুদেব! আমি ভাগ্যক্রমেই এখানে আসিয়াছি, আমার তৃষ্ণা কি যথার্থই নিবারিত হইবে? সত্য সত্যই কি আমি গোবিন্দজীউর দর্শন লাভ পাইব?" ইন্দুভূষণ স্বামীজীকে দেখিয়াই, ভক্তি গদগদচিত্তে আপনভোলা হইয়া স্বামীজীকে গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।

স্বামী ইন্দুভূষণকে কখন দেখেন নাই। তিনি স্বপ্নেও জানিতেননা যে ইন্দুভূষণ অতুলৈশ্বর্য্যত্যাগী, ইন্দুভূষণ বৈরাগী, ইন্দুভূষণ পরমতত্ত্ব-লাভ তৃষ্ণায় তৃষিত। কিন্তু যোগবলে স্বামীর কাছে কিছুই অবিদিত থাকে না। তিনি যোগবলে মানবহৃদয়ের গূঢ়ভাব অবগত হইতে সমর্থ। কারণ তিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞান বশত অবগত হইয়াছেন, যে একই পরং-আত্মা ব্যাপকভাবে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন অতএব আত্মার অভেদত্ব বশত জানিতেন যে একের আত্মাও পরংব্রহ্ম, অপর দেহধারী জীবের আত্মাও পরংব্রহ্ম, তাই ব্রহ্মবিদ্ অন্য জীবের হৃদয়-ভাব জানিতে পারেন, সেইজন্য ব্রহ্মবিদ্ অন্তর্যামী। সেই জন্য ব্রহ্ম জ্ঞানীর অভেদ জ্ঞান, এই জন্য ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া থাকেন "আত্মবৎ সর্ব্ব ভূতেষু।" তাই আজ ইন্দুভূষণের মুখচ্ছবি দেখিয়াই স্বামী মহাশয় বুঝিলেন অবিচ্ছিন্ন ভক্তিও গভীর বিবেক-সংযোগে তাঁহার হৃদয়ে সমুজ্জল বৈরাগ্যোদয় হইয়াছে—বুঝিলেন ইন্দুভূষণ ত্যাগীপুরুষ, সংসারের অনিত্য সুখ তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই—ভাসিয়া উঠিয়াছে—তাঁহার মায়ার ঘোর কাটিয়াছে।

স্বামী দেখিলেন পুত্তলি গঠিত হইয়া যেখানে যে যে রঙ্গের প্রয়োজন তাহা দেওয়া হইয়াছে, চক্ষুও চিত্রিত হইয়াছে, পুত্তলিকার যাহা আবশ্যক সকলই হইয়াছে। পুত্তলিকা মনুষ্যের আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু পুত্তলিকা এখনও পুত্তলিকা। পুত্তলিকার হস্ত পদ আছে, অঙ্গুলি আছে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা আছে, ভ্রযুগল আছে, কেশ-দাম বিবচিত আছে,। সকল থাকিয়াও পুত্তলি পুত্তলিকা মাত্র। চরণ-যুগল থাকিয়া ও পুত্তলি চলিতে পারেনা, হস্ত থাকিয়া ও পুত্তলি তাহা পরি-চালনে অসমর্থা, মুখ থাকিয়াও তাহা ব্যাদান করিতে পারেনা, কর্ণ যুগল থাকিয়াও শ্রবনে অক্ষম, নয়নদ্বয় থাকিয়া দর্শনে অসমর্থ। পুত্তলিকা ক্রিয়া শূন্য, চেতনা শূন্য, নির্জ্জীব। এক চৈতন্যাভাবে পুত্তলিকা ক্রিয়া শূন্য।

স্বামী দেখিলেন ইন্দুভূষণ পুত্তলিকাবৎ ক্রিয়া শূন্য। তাঁহার অন্তরেন্দ্রিয় ক্রিয়া শূন্য। তাঁহার সূক্ষ্মদেহে চৈতন্যোদয় হয় নাই। তাই স্বামী মহাশয় বুঝিলেন ইন্দুভূষণের সূক্ষ্মদেহ বৈরাগ্যোদয়ে গঠিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু এখন ও তাহাতে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হয় নাই, তাই তাঁহার সূক্ষ্মদেহ ক্রিয়া শূন্য।

চৈতন্য, সূক্ষ্মদেহে কুল-কুণ্ডলিনী নামে অবস্থান করিতেছেন। কুল কুণ্ডলিনী জাগ্রত নাহইলে চৈতন্যোদয় হয় না, চৈতন্যোদয় না হইলে অন্তরেন্দ্রিয় ক্রিয়া শূন্য থাকে। যে সময় কুল-কুণ্ডলিনী সূক্ষ্মদেহকে সজীব করিয়া তন্মধ্যস্থ চতুর্দ্দল হইতে সহস্রদল পদ্ম প্রস্ফুটীত করিয়া দিয়া, জীবাত্মা পরমাত্মায় সংযোজিত করিয়া দেয়, তখনই মানবের বাহ্য জ্ঞান নিবৃত্তি পায়, এবং অন্তরেন্দ্রিয় জাগ্রত হইয়া উঠে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোজনাই যোগনামে অভিহিত। বৈরাগ্যোদয়, দেহীর একটী অবস্থা মাত্র। বৈরাগ্যোদয় হইলে সহজেই সামান্য ক্রিয়া সংযোগে কুল-কুণ্ডলিনী জাগ্রত হন। কুল-কুণ্ডলিনী সূক্ষ্মদেহের চৈতন্য স্বরূপিনী। সর্প যেরূপ খোলস ছাড়িয়া নব-দেহ ধারণ করে। চৈতন্যোদয়ে মানবও সেইরূপ নূতন দেহ ধারণ করিয়া বাহ্যজগত ছাড়িয়া অন্তরেন্দ্রিয়ের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া

মহাযোগে সমাসীন হয়। সেই অবস্থায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে মানবের ভাবাবস্থা আসে। যোগের চরমাবস্থাই মহাভাব। ইহাই সমাধি। মৎস্যকে ভূমি হইতে জলে ছাড়িয়া দিলে তাহার যেরূপ আনন্দ হয়, মুক্তজীব সমাধি-কালে সেইরূপ এক অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ সম্ভোগ করে। কোন জীবের চৈতন্যোদয়ের পূর্ব্বেই বিবেকের সঞ্চার হইয়া, বৈরাগ্যোদয় হয়। কাহার ও বা বিবেকজ্ঞান সঞ্চারিত হইয়া, পরে কুল-কুণ্ডলিনী জাগ্রত হন। কোন উদ্ভিদ ফল মুখে করিয়া ফুলোৎপাদন করে, কাহারও ফুল হইয়া ফল হয়। ইহা কেবল পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ক্রিয়াযোগের ফল মাত্র। যে যেমন সৎক্রিয়া বলে পূর্ব্বজন্মে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে, ইহজীবনে ক্রিয়া শক্তি তাহাকে তেমনি সাহায্য করে। জগতের কি সুন্দর নিয়ম! কি চেতন কি অচেতন সকল পদার্থেই অন্তর্নিহিত সার আছে। উপরের আচ্ছাদন সকল পদার্থেরই কঠিন, সেই কঠিন আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিতে পারিলেই ভিতরের সার বাহির হয়। হাড়ের খাঁচা ভাঙ্গিতে পারিলেই অন্তরেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সচ্চিদানন্দ পরং ব্রহ্ম মায়া দ্বারা আবৃত, মায়া অপসৃত করিতে পারিলেই সচ্চিদানন্দ দর্শন লাভ হয়। তাই বেদব্যাস যখন পরং ব্রহ্ম দর্শন করেন তখন মায়াকে ব্রহ্ম হইতে দূরে অবস্থান করিতে দেখেন। ইন্দুভূষণের হৃদয় পরম পদার্থ লাভে অধীর ছিল, সেই তৃষ্ণাই তাহার বলবতী ছিল, তাই স্বামী মহাশয় তাঁহাকে দেখিবামাত্র কহিয়া ছিলেন "কি বাবা! বড় তৃষ্ণা! তোমার তৃষ্ণা শীঘ্রই নিবারিত হইবে"।

ইন্দুভূষণ কহিলেন "স্বামিন্! আমার কিসে ঘোর তৃষ্ণা"?

স্বামী। "বৎস! তোমার ব্রহ্মলাভ তৃষ্ণা বড়ই বলবতী"?

ইন্দুভূষণ সকাতরে কহিলেন "কিসে জানিলেন প্রভো"!

স্বামী। "তোমার স্বীয় অবস্থাই তাহা প্রকাশ করিতেছে"।

ইন্দুভূষণ। "কি অবস্থা প্রভো"!

স্বামী। "বৈরাগ্যাবস্থা"।

ইন্দুভূষণ। "দীনের সদাই বৈরাগ্যাবস্থা"।

স্বামী। "তুমি ব্রহ্মলাভের ভিখারী বটে।"

ইন্দুভূষণ। "প্রভো! আমি দরিদ্র, পথেরভিখারী, ব্রহ্ম কি পদার্থ জানি না?"

স্বামী। "তুমি অতুলৈশ্বর্য্যেরঅধিপতি। তুমি রাজা। এক্ষণে ব্রহ্ম-পিপাসু। ঐশ্বর্য তোমার পক্ষে লোষ্ট্রবৎ, মান তোমার নিকট ছায়া মাত্র।"

ইন্দুভূষণ স্বামীর কথায় চমকিত হইলেন। স্বামী কিরূপে জানিলেন তিনি ব্রহ্ম পিপাসু? কিসে জানিলেন তাঁহার অতুলৈশ্বর্য্য? কিসে জানিলেন বৈরাগ্য বশতঃ মায়াময় জগতের অনিত্য বস্তু সকল ছাড়িয়াছেন। তবে কি স্বামী দেবতা? হইতেও পারেন, ইত্যাদি চিন্তা করিয়া কহিলেন "প্রভো! ব্রহ্ম কি পদার্থ?"

স্বামী। "ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্ভ্রম, নিস্পন্দ, নিরাকার, নির্দ্বন্দ, নির্ব্বিকার, অদ্বৈত স্বরূপ, নিত্য চৈতন্য।"

ইন্দুভূষণ। "ইহাতো কিছুই বুঝিলাম না?"

স্বামী। "যখন ঈশ্বর গুণের অতীত ও ক্রিয়ায় বহির্ভূত, তখনই তিনি পরব্রহ্ম"

ইন্দুভূষণ। "গুণের অতীত এবং ক্রিয়ায় বহির্ভূত বিষয় তো বোধগম্য হইতেছে না তাহাতো মনে ধারণা করিতে পারিতেছি না।"

স্বামী। "যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নহে, তাহা ইন্দ্রিয়ের আধার স্বরূপ মনে, কিসে ধারণা করিবে। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গোচর নহে। মনের অতীত।"

ইন্দুভূষণ। "তারপর প্রভো!"

স্বামী। "তিনি গুণের সমষ্টি এবং ক্রিয়ার আধার স্বরূপ।"

ইন্দুভূষণ। "যখন তিনি গুণ ও ক্রিয়ার অতীত, আবার কিরূপে তিনি গুণময় ও ক্রিয়াবান্ হইবেন?"

স্বামী। "যখনই তাঁহাতে গুণ আরোপিত হইল, এবং যখনই তিনি সক্রিয়, তখনই তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান। তখন আর তিনি নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মপদ বাচ্য নহেন।

ইন্দুভূষণ। "কি করিয়া তাঁহাকে ধারণা করিব। সাকার না ভাবিলে যে ভাবনার ব্যত্যয় হয় ?"

স্বামী। "ঈশ্বর প্রথমে সাকার, পরে নিরাকার, সাকার লইয়া সাধনা করিলে নিরাকারত্ব আপনি আসিবে। কোন বিষয় উপলব্ধি করিতে হইলে দুইটী প্রক্রিয়া দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি হয়, সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ। সংশ্লেষণে বাষ্প হইতে জল, জল হইতে অণু, অণু হইতে পরমাণু ইত্যাদি ক্রমে শেষে জড়ভাবে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যায়। কিন্তু বিশ্লেষণে পূর্ণ জড়ত্ব হইতে, তবে জড় কারণে আসা যায়, সেই জড় কারণই চৈতন্য।"

ইন্দুভূষণ। "তিনি কি সাকার হইয়া প্রকাশিত হন ?"

স্বামী। "স্বীয় শক্তিতে তিনি প্রকাশমান। এই ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া ব্রহ্মাণ্ড পতির অস্তিত্ব বুঝিতে হয়।"

ইন্দুভূষণ। "তাঁহাকে না বুঝিলে, তাঁহার শক্তি কি বুঝিব ?"

স্বামী। "জলে বৃক্ষের প্রতিবিম্বিতের ন্যায় এই ব্রহ্মাণ্ড জগৎ পতির প্রতিবিম্ব মাত্র। দিবসে তারা দেখা যায় না বলিয়া তারার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। শক্তি সঞ্চারিত না হইলে ব্রহ্ম নির্গুণ এবং ব্রহ্মাণ্ড জড়পিণ্ড মাত্র।"

ইন্দুভূষণ। "তবে ব্রহ্মের কি কোন ক্ষমতা নাই" ?

স্বামী। "তাঁহাতে সকলই আছে অথচ কিছুই নাই, তিনি নিত্য, সত্য, চৈতন্য স্বরূপ। শক্তি তাঁহাতেই সন্নিবিষ্ট। শক্তি ভিন্ন তিনি ক্রিয়া শূন্য। ব্রহ্ম, জ্ঞান স্বরূপ, সত্য স্বরূপ, অনন্ত, অনাদি, নিরাকার।"

ইন্দুভূষণ। "আমি স্বয়ং অজ্ঞান হইয়া পূর্ণ জ্ঞানকে কি বুঝিব প্রভো !"

স্বামী। "মলিনত্ব বিদূরিত হইলেই নির্ম্মল জলে চন্দ্রোদয় দেখিতে পাওয়া যায়, জ্ঞানোদয়ে সকলই বুঝিবে। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইবে। যে কাতর ভাবে তাঁহাকে ডাকে সেই তাঁহাকে পায়। তুমি কাতর ভাবে তাঁহাকে ডাকিতে শিখ, তাঁহাকে পাইবে।"

ইন্দুভূষণ। "আমি বলিয়াছি আমি অজ্ঞান, আমি দীনের দীন হীনের হীন, তবে আমি তাঁহাকে কিসে পাইব প্রভো" !

স্বামী। "দীনের দীনই তাঁহাকে পায়, দীন হীন হও, ভিখারি হও। অজ্ঞানতা ত্যাগ কর, তিনি তোমারই হইবেন। দেহাভিমান ত্যাগ না করিলে তিনি অবোধ্য। দেহ মায়াময় প্রপঞ্চক মাত্র! আত্মাইনিত্য, জ্ঞানের বিকাশ হইলেই তাঁহার সত্বা উপলব্ধি হইবে। তিনি দীনের বলিয়াই তাঁহার নাম দীননাথ।"

ইন্দুভূষণ। "তবে কি আমি তাঁহাকে পাইব প্রভো!"

স্বামী। "কাতর ভাবে ডাকিলেই তাঁহাকে পাইবে।"

ইন্দুভূষণ। তিনি কি দীনে দয়া করেন?"

স্বামী। "হাঁ বৎস্য! তিনি দীন দয়াল।"

ইন্দুভূষণ। "এক্ষণে ব্রহ্ম ও শক্তি একই পদার্থ তাহা বুঝাইয়া দিয়া আমার তৃষিত প্রাণকে পরিতৃপ্ত করুন।"

স্বামী। "নির্ব্বোধ বালক! অধীর হইও না। শান্তি অবলম্বন কর সকলই জানিতে পারিবে।"

ইন্দুভূষণ। "আমার শান্তি কোথায় প্রভো?"

স্বামী। "শান্তি ব্রহ্মে। তাঁহাতে সমস্ত অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাক, তাঁহার কার্য্য তিনিই করিবেন"।

ইন্দুভূষণ। "তাঁহার কার্য্য তিনি করিবেন বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কি কার্য্য আপনি সিদ্ধ হইবে"?

স্বামী। "তাঁহার কার্য্য তিনিই করেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তোমাতেই বিদ্যমান। তুমি কার শক্তিতে অতুলৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়াছ? কার শক্তিতে দারাপত্য ত্যাগ করিয়াছ? কার শক্তিতে আজ তোমার বৈরাগ্যোদয় হইয়াছে? কার শক্তিতে আজ তুমি ব্রহ্ম-পদ-লাভ প্রত্যাশী?"

ইন্দুভূষণ শক্তি মাহাত্ম বুঝিয়াও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। কহিলেন "প্রভো! ব্রহ্ম ও শক্তি সম্বন্ধে সহজে বুঝাইয়া দিন?"

স্বামী। যেমন গঙ্গা ও গঙ্গার তরঙ্গ, ব্রহ্ম ও শক্তি তেমনি। গঙ্গা নাম মাত্র, তরঙ্গ তাঁহার ক্রিয়া। নিথর গঙ্গা ক্রিয়া শূন্য। পূর্ণ ব্রহ্ম ও ক্রিয়া

শূন্য। তরঙ্গ লইয়া গঙ্গা, শক্তি লইয়া ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ভিন্ন শক্তি থাকিতে পারে না। গঙ্গা ভিন্ন ও তরঙ্গ থাকিতে পারে না। অতএব ব্রহ্মই শক্তির আধার; তাই বলিতেছি ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ্য। ব্রহ্মে শক্তি বিকাশ হইলে অনন্তরূপে প্রকাশমান হন, তাই জগদম্বার অনন্ত মূর্ত্তি। গঙ্গায় তরঙ্গ উত্থিত হইয়া তাহা অনন্তরূপে ইতঃস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হয়, ব্রহ্মে শক্তি সঞ্চারিত হইয়া এক ব্রহ্ম বহু আকারে প্রকাশিত হন। এই জন্য বেদে পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছে।

"একো বর্ণো বহুধা শক্তি যোগাৎ,
বর্ণন্যনেকানি নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্ব মাদৌ,
শুভয়া সদ্বুদ্ধ্যা সমযুনক্তু॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই—একই বর্ণ বহু শক্তি যোগে বহু অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে।

এখানে বেদ নিরাকারবাদী হইয়াও অতি সহজে সাকারবাদিত্ব দেখাইয়াছেন। তরঙ্গ ধরিয়া না যাইলে, গঙ্গায় পৌঁছান যাইবে না, সাকার সাধনা না করিলে নিরাকার চৈতন্যের জ্ঞান আসিবে না। পাশ্চাত্য আবিষ্কারক পণ্ডিতগণ এক একটী ভূতের এক একটী ক্রিয়া ধরিয়া এক এক ভূতের এক একটী গুণ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে প্রপঞ্চই গুণের কারণ। বেদে বিশ্লেষণ ক্রিয়া দ্বারা ইহার বৈপরিত্য মত সংস্থাপন করিয়াছেন। আদি প্রকৃতির কারণীভূত গুণত্রয় স্বীকার করিয়া তাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সেই আদি গুণত্রয় শক্তির কারণ, অথবা গুণে শক্তি নিহিত থাকায় গুণের কারণ শক্তিই প্রতিপন্ন হইয়াছে। গুণত্রয়ের সাম্যতাই প্রকৃতি, এবং শক্তি দ্বারা গুণের সংযোগই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ। শক্তি জড় চৈতন্য হইয়া ও পূর্ণ চৈতন্য। অতএব শক্তিই ব্রহ্ম লাভের উপায়, সেই জন্য শক্তি উপাসনার এত আদর, এত আধিক্য, ভারতবাসীর অস্থি মজ্জায় শক্তি মন্ত্র বিজড়িত। প্রাচীন ঋষিগণ জগন্নিয়ন্তার সৃষ্টি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া যেমন তাঁহার বরণীয়

জ্ঞান ধ্যান করিবে, অমনি, কেবল তাঁহার স্রষ্ট সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী চক্ষের উপর পতিত হইয়া আর ঋষিগণকে ধ্যান মগ্ন রাখিতে পারিল না, ঋষিগণ অমনি সেই স্রষ্টার শক্তি গান করিতে আরম্ভ করিলেন ; আর্য্য ঋষির সেই প্রথম গীতবেদ এবং বেদোক্ত গায়ত্রী। অমনি হিমাদ্রী শেখর হইতে 'গায়ত্রী ধ্বনিত হইল।

"শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য প্রথমে শক্তি স্বীকার করিতেন না। এক পরং আত্মা ভিন্ন আর কাহার ও অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। এক সময় কাশিধামে উদরাময় পীড়ায় নিতান্ত কাতর হইয়া অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, পার্ব্বতী শঙ্করাচার্য্যকে শক্তি শিক্ষা দিবার জন্য আহীরীণীবেশে দধি বিক্রয়ার্থ গমন করিতেছিলেন, শঙ্কর দধির নাম শুনিয়া তাহা ভক্ষণে তাঁহার অতিশয় স্পৃহা জন্মিল, এবং আহীরীণীকে দধি আনয়নার্থ আহ্বান করিলেন। আহীরীণী স্ত্রীলোক, সুতরাং সে একা পুরুষের নিকট যাইতে অস্বিকার করিয়া কহিল "দধির প্রয়োজন থাকে এই স্থানে আসিয়া দধি লইয়া যাও" শঙ্করাচার্য্য কহিলেন "আমি শক্তি হীন তোমার নিকট যাইতে নিতান্ত অসমর্থ "তাহাতে আহীরীণী হাসিয়া কহিল "মহাশয় শক্তি নাই কি কহিতেছেন? আপনি তো শক্তি স্বীকার করেন না।" পূর্ণ জ্ঞানী শঙ্করের ভ্রম বিদুরিত হইল, আহীরিণী বেশিনীকেপূর্ণ শক্তি স্বরূপিণী জানিতে পারিয়া শঙ্করাচার্য্য তাঁহার স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন তদবধি শঙ্করাচার্য্য শক্তি স্বীকার করিলেন।

যখন নারায়ণ অনন্ত শয্যায় শায়িত, ঘোর মহামায়ায় অভিভূত হইয়া অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত, পৃথিবী জলমগ্ন, আকাশ তমসাচ্ছাদিত, ব্রহ্মা নারায়ণের নাভি-কমলোত্থিত কমলে গভীর ধ্যান মগ্ন হইয়া অধিষ্ঠিত। নারায়ণের দুই কর্ণমল হইতে দুই অসুর সমুদ্ভূত হইয়া বিকট দশনে পিঙ্গললোচনে দীর্ঘবাহু প্রসারিত করিয়া ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে অগ্রসর। ব্রহ্মার ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছে, তিনি ভয়ে কম্পিত, ত্রাসে নিতান্ত ত্রস্ত। দৈত্যবিনাশের শক্তি নাই, ক্ষমতা নাই, শক্তিরআধার অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত। যাঁর শক্তি বলে ব্রহ্মা স্বয়ং শক্তিমান, সেই সর্ব্ব শক্তিমান নারায়ণ নারাশ্রয়ে নিদ্রিত। ব্রহ্মা কার শক্তি বলে বলীয়ান হইয়া সেই

দুর্দ্দমনীয় দৈত্য বিনাশে অগ্রসর হইবে? কেইবা অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত নারায়ণের মহানিদ্রা ভঙ্গ করিতে সক্ষম? ব্রহ্মা বিষম সমস্যায় উপনীত হইয়া শেষে মায়ারূপী নিদ্রাদেবীর আরধনা করিতে লাগিলেন। তাই ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখে গীত হইল!

"যা দেবি সর্ব্ব ভূতেষু সৃষ্টি রূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু মায়া রূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবি সর্ব্ব ভূতেষু নিদ্রা রূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

আর মহামায়ারূপিনী নিদ্রা স্থির থাকিতে পারিলেন না, ব্রহ্মার স্তবে প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইয়া, বরযাজ্ঞা করিতে কহিলেন। ব্রহ্মা অন্য বর যাজ্ঞা না করিয়া নারায়ণ হইতে তাঁহাকে অপসৃত হইতে কহিলেন। মহামায়া তাহাই করিলেন। নারায়ণের অনন্ত নিদ্রা ভঙ্গ হইল। লক্ষ্মীর ক্রোড়ে নারায়ণ শয়ন করিয়াছিলেন। যোগমায়া অপসৃত হইলে নারায়ণের বদন হইতে সহস্র বজ্র-নাদী হুঁঙ্কার-ধ্বনী সমুত্থিত হইয়া মধুকৈটভ দৈত্যদ্বয় বিনষ্ট হইল। চক্ষুরুন্মিলন করিয়া লক্ষ্মীকে সম্মুখে দেখিয়াই নারায়ণ ঈষৎ হাসিলেন। অমনি শক্তি সংযোগে বিশ্ব সৃষ্টি কল্পিত হইল। ব্রহ্মাকে সৃষ্টি কল্পনা করিতে আদেশ করিলেন। অনন্ত জলধি হইতে পৃথিবীর আবিষ্কার হইল। ক্রমে পশু পক্ষি, জীব জন্তুর সৃষ্টি হইয়া বিশ্ব রচিত হইল। অতএব দেখা যায় সৃষ্টির পূর্ব্বে নারায়ণের হুঁঙ্কার ধ্বনি পরক্ষণেই, শক্তি সন্দর্শনে পরমানন্দোত্থিত হাসির রেখা, তদ্‌পরেই সৃষ্টির পরিকল্পনা। ইহাই নাদ, বিন্দু, এবং চন্দ্র, যাহা নারায়ণের লিঙ্গ দেহের কল্পিতাকার। ইহাই ওঁকার। সৃষ্টির আদিতে ওঁকার, মানবদেহের আদিতে অর্থাৎ মস্তকে ওঁকার; গুরুপাদুকার উপরি নাদ, বিন্দুও চন্দ্র। এই স্থানে মহাশিব, আদ্যাশক্তি ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্ট। ইহাঁদের বাসস্থান মহাশ্মশান। দেহ মধ্যে মস্তকে মহাশ্মশান।

তাই তন্ত্রে নরকপাল মহাপাত্র নামে অভিহিত। সৃষ্টির প্রথমে মহাশ্মশান, সৃষ্টির অন্তেও মহাশ্মশান। তাই মা জীবের জীবিতাবস্থায় তুই মা জগদম্বা, অন্তে শ্মশানবাসিনী। তাই শ্মশানবাসিনীর এত আদর। এই নিরাশ্রয় জীব যখন ভয়ানক মহাশ্মশানে উপস্থিত হইবে, তখন শ্মশানবাসিনী তুই ব্যতিত্ত আপনার ব'লে পাতকী জীবকে কে অনন্ত কোল পাতিয়া দিবে? কে সস্নেহ বচনে বলিবে ভয় নাই! ভয় নাই! সন্তান! আমিএ ভীষণ মহাশ্মশানে তোমাকে রক্ষা করিতেছি। স্বামী কহিলেন বৎস্য! সেই জন্য সাধক সংসারে শ্মশান পরিকল্পনা করিয়া তাঁহাকে অগ্রে হইতেই ডাকিতে শিখে, পাছে অন্তে মহাশ্মশান দেখিয়া ভীত হইয়া মাকে ডাকিতে ভুলিয়া যায়। আনন্দময়ি! আমার মহাশ্মশানে মহাশিবের কোলে থাকিয়া নৃত্য কর! একবার ভুবন-ভোলা সেই নৃত্য দেখিয়া জীবন মন পরিতৃপ্ত করি!" স্বামী মহাশয় এই সকল কথা বলিতে বলিতে যোগে মগ্ন হইলেন। ইন্দুভূষণ বিভোর, আনন্দে তাঁহার চিত্ত পুলকিত হইল। মহাযোগীকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না, অনিমিশ লোচনে স্বামীর যোগভাব অবলোকন করিয়া চক্ষু-রীন্দ্রিয় সার্থক করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামীর যোগ ভঙ্গ হইল। স্বামী কহিলেন "বৎস্য! পথশ্রান্তি বিদুরিত কর। শীতল জলে অবগাহন করিয়া পূতদেহে ললাটেশ্বরীর পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ কর!" ইন্দুভূষণ বিমুগ্ধ ছিলেন, সহসা স্বামীর বাক্যে তাঁহার চৈতন্ত হইল। সেই সময় মন্দির মধ্যে বাদ্যধ্বনী হইল। স্বামী মহাশয় কহিলেন "রাত্রে যাত্রীগণ মন্দিরে কিম্বা ইহার সন্নিকটে থাকিলে পাছে হিংস্র জন্তুতে তাহাদের হিংসা করে তজ্জন্য দিবাবসানের পূর্ব্বেই যাত্রী-গণকে সতর্ক করা হয়, যেন তাহারা গ্রামে যাইয়া রাত্রি যাপন করে। সন্ধ্যার অগ্রেই দেবীর আরতির পূর্ব্বে দেবালয়ের তোরণ দ্বার বন্ধ হয়। যাত্রী-গণকে সতর্ক করিবার সঙ্কেত স্বরূপ এই সময় বাদ্যধ্বনি হইল "স্বামী মহাশয় ইন্দুভূষণকে কহিলেন "আর বিলম্বের অবসর নাই, এখনই দীর্ঘিকায় অবগাহন করিয়া আইস।"

ইন্দুভূষণ কি করেন স্বামীর আদেশ শিরোধার্য্য জ্ঞান করিয়া অনিচ্ছা-সত্ত্বেও দীর্ঘিকায় অবগাহন করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। দীর্ঘিকার নাম সরিদ্গঙ্গা। ইন্দুভূষণ সরিদ্গঙ্গায় স্নান করিয়া পূতদেহে সান্ধ্যাহ্নিক নিত্য ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া দেবী-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন। মন্দিরের বহির্দ্দেশে নহবত বাজিয়া উঠিল, তোরণদ্বার বন্ধ হইল। দেবসেবায় নিযুক্ত ব্রাহ্মণ দেবীর আরতি আরম্ভ করিল। আরতি শেষ হইলে স্তুতি গান হইল, স্বামী মহাশয় দেবীর মাহাত্ম্য গীত করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন। ইন্দুভূষণ দেবীর প্রসাদ পাইয়া স্বামীর সহিত বিশ্রামাগারে গমন করিলেন। মন্দিরের কবাট সে রাত্রের জন্য রুদ্ধ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে ইন্দুভূষণ উদ্যান-বাটীকা হইতে অপসৃত হইয়া গৃহত্যাগী হন, সে রাত্রে তাঁহার বাটীতে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। বহুক্ষণ হইল উদ্যান বাটীকার বৈঠকখানায় গীত বাদ্য থামিয়াছে, ইন্দুভূষণ তখনও প্রত্যাবৃত্ত হন নাই দেখিয়া, তাঁহার পার্শ্বচরবৃন্দ উদ্যানের ইতস্ততঃ তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না। দ্বিতল উদ্যান-বাটীকার বারাণ্ডা ও সমস্ত প্রকোষ্ঠে অনুসন্ধান করিয়া, উদ্যানের সমস্ত নিভৃত স্থানে ইন্দুভূষণের অনুসন্ধান হইল। কেহ, বাপীতীরে যাইয়া সোপানাবলী খুঁজিল, যদি স্নিগ্ধসমীরণ সেবনবাসনায় সেখানে অবস্থান

করেন। কেহবা লতামণ্ডপ সমূহ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিল, নির্জ্জন স্থান ভাল বাসেন বলিয়া যদি তথায় বসিয়া থাকেন। কোন্ সহচর বটবিটপীমূলে যাইয়া তাঁহার অনুসন্ধান লইল, যদি তথায় বসিয়া একাগ্রচিত্তে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে থাকেন। কোন ভৃত্য উদ্যান বাটীকা পার হইয়া গ্রাম মধ্যে কর্ত্তা বাবুরসমাচার লইতে চলিল। কেহবা ভাগীরথী তীরে বহুদুর যাইয়া তাঁহার অনুসন্ধান লইল, যদ্যপি গাঙ্গবারিসম্পৃক্ত হিল্লোল সেবনার্থ বহুদুর আসিয়া পড়িয়া থাকেন; কিন্তু কোথাও ইন্দুভুষণের সমাচার পাওয়া গেল না। তিনি কোথায় যাইলেন? কেন এখনো ফিরিলেন না? ইত্যাদি আন্দোলনে ক্রমে বিলম্ব হইয়া গেল। রাত্রি অধিক হইয়াছে তথাপি তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত না দেখিয়া কোন ভৃত্য বাবুর নিজ বাসভ-বনোদ্দেশে গমন করিল, কিন্তু ইন্দুভুষণতো বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হন নাই। তিনি বাটীতে গমন করিলে একা যাইতেন না, কিম্বা পদ-ব্রজে ও গমন করিতেন না। রাত্রি প্রায় স্বার্দ্ধ দ্বিপ্রহরের পর বাটীতে সম্বাদ পৌছিল, "কর্ত্তা বাবু কোথায় গিয়াছেন কোন সংবাদই পাওয়া যাইতেছে না" বাবুর নিরুদ্দেশ সম্বাদ প্রথমে তাঁহার কর্ম্মচারীর নিকট পৌছিয়া শেষে কর্ত্রীর নিকট পৌছিল। হিন্দোলা সে সংবাদে নিতান্ত অধীর হইলেন। বিপদ সাগরে পড়িয়া হিন্দোলা বুক বাঁধিলেন। ইন্দুভূষণের অনুসন্ধানার্থ চারিদিকে লোক প্রেরিত হইল। হিন্দোলা তাঁহার স্বামীর স্বভাব চরিত্র বিষয়ে বিশেষ বিদিত ছিলেন। তাঁহার কেহ অনিষ্ট করিবে না ইহা জানিতেন, কারণ জগতে ইন্দুভুষণের কেহ শত্রু নাই তিনি অজাতশত্রু। তিনি আত্মঘাতী হইবেন না, কেন না তাহার কোন কারণই উপস্থিত নাই, বিশেষত জানিতেন আত্মারাম ইন্দুভূষণ আত্ম বিনাশের জন্য উদ্যত হইবেন না। তবে কি বালিকা হিন্দোলাকে ছলনা করিবার জন্য তিনি কোথায় প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করিতেছেন? না! না! তিনি সে প্রকৃতির লোক নহেন, প্রতারণা সে সরল হৃদয়ে প্রতিপোষিত হইবার নহে। তবে কি তিনি আমায় ভাল বাসেন না বলিয়া আমায় পরিত্যাগ করিলেন?

একথার উত্তর নাই, এবার হিন্দোলা নীরব, নীরবে একবিন্দু অশ্রু বিগলিত হইল।—অন্তঃস্থল ভিন্ন হইয়া সেই এক বিন্দু অশ্রু কোমলাঙ্গীর নয়ন উছলিয়া গণ্ড বাহিয়া বিগলিত হইল। পবিত্র প্রেমে সন্দেহ হইল—গভীর ভাল বাসায় সংশয় জন্মিল। নিথর হৃদয় সাগরে তুফান উঠিয়াছে—সেই তুফান উছলিয়া এক বিন্দু জল চক্ষে আসিয়া গণ্ড বহিয়া পতিত হইল—বালিকা মৃদুস্বরে কহিল "আমাকে ভাল বাসেননা বলিয়া কি আমায় পরিত্যাগ করিলেন? আমাকে ভাল বাসিতে না পারেন, কিন্তু সোনার পুত্তলি গুলিতো তাঁর গলার হার"!

এই কথা বলিতে না বলিতে আর এক বিন্দু অশ্রু নয়ন হইতে বিগলিত হইল। হিন্দোলার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, প্রাণ মন অস্থির হইল, ক্ষণকাল আবার নীরব থাকিয়া চিন্তা করিলেন, বালকেরা তাঁহার সম্বন্ধে কথা কহিলে কিম্বা তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাইলে কতই কাতর হইবে, কতই কাঁদিবে, কতই আবদার করিবে। হিন্দোলা আপন হৃদয় শূন্য দেখিলেন—সংসার শূন্য দেখিলেন—চন্দ্রমাশালিনীনৈশাকাশ শূন্য দেখিলেন—জগতময় সকলই শূন্য দেখিলেন। সোনার সংসার আজ তাঁহার পক্ষে অরণ্য সদৃশ, অতুলৈশ্বর্য্য বিষবৎ। কাতরা, বিরহ-বিধুরা অবলা বালিকা কাহার নিকট হৃদয় বেদনা কহিয়া শান্ত হইবে? কাহার নিকট প্রাণের কবাট ঈষৎ খুলিয়া দিয়া ব্যথিত হৃদয় প্রশমিত করিবে? সংসারে তাহার ননদিনী নাই যে, তাহার কাছে প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবে। আপনার বলিবার এই বৃহদট্টালিকায় হিন্দোলার কেহই নাই। পৌরজন সকলেই তাঁহার দাস-দাসী মাত্র। তাহাদের কাছে হিন্দোলা প্রাণের কবাট খুলিতে সম্মত নহে, তাহারাতো কেবল পর মাত্র। ক্রমে হিন্দোলার কালরাত্রির অবসান হইল। সুখতারা সমুজ্জল কিরণে প্রাচী-দিকে সমুদ্ভাষিত হইল—কুসুম সুবাসিত বসন্তানিল মৃদু-মন্দ সঞ্চারিত হইল—পতত্রীকুল পত্রাবগুণ্ঠণে মধুর স্বরে সুখ প্রভাত গীত গাহিল।—সর্ব্বরী প্রভাত হইল। রবি অস্তমিত হইলে পুনঃ সর্ব্বরী আসিবে, কিন্তু হিন্দোলার সুখ সর্ব্বরী এজনমের মত পোহাইল—

আর আসিবেনা। রজনী প্রভাতা হইলে যাহারা ইন্দুভূষণের সংবাদ লইতে গিয়াছিল, একে একে প্রায় সকলেই নিরাশ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। তাহারা ইন্দুভূষণের জন্য নানা স্থান পর্য্যটন করিয়াছে, কিন্তু কোথাও তাঁহার অনুসন্ধান পাঁয় নাই। সকলে ফিরিয়া আসিবার পর একটী ভৃত্য তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছিল। সেই পুরাতন ভৃত্য কেবল এখনো পর্য্যন্ত ফেরে নাই। সে ইন্দুভূষণের পিতার আমলের চাকর; তাহারই ক্রোড়ে ইন্দুভূষণ লালিত, পালিত, ও বর্দ্ধিত। ইন্দুভুষণের মাতার বিয়োগান্তে শিশু ইন্দুভূষণ তাহারই নিকট থাকিত, পিতার মৃত্যুর পর তাহারই পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিত। সে ভৃত্য হইয়াও ইন্দুভূষণের নিকট সামান্য চাকরের ন্যায় ছিলনা। ইন্দুভূষণ তাহাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিয়া সেইরূপ মান্য করিতেন, সেও ইন্দুভূষণকে অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিত। সংসারে তাহারও কেহ ছিলনা, ইন্দুভুষণকে লইয়া সে সংসারে মমতা বাঁধিয়া সংসারী হইয়াছিল। ইন্দুভুষণ ও তাহাকে পাইয়া মাতৃ পিতৃ শোক বিস্মরণ হইয়া সকল কার্য্যেই তাহাকে প্রধান সহায় জ্ঞান করিতেন। সেই ভৃত্যের বিনা পরামর্শে ইন্দুভূষণ কোন কার্য্যই করিতেন না। হিন্দোলাও অকপটে তাহার সহিত কথা কহিত, তাহার আদেশে সংসারের সকল কার্য্য করিত। তাহাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া তেমনি ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। সকল ভৃত্য ইন্দুভূষণের অনুসন্ধানে বিমুখ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে সে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলনা, তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে, সে উন্মত্ত প্রায় হইয়া অন্দরে প্রবিষ্ট হইল। বালিকা হিন্দোলা ধুলি শয্যায় শয়ানা, দরবিগলিত বারি ধারা পতনে নয়ন যুগল আরক্তিম, যেন প্রাতঃ সূর্য্য ঘন হিমানি সন্নিপাতে বিধৌত। হলধর অন্দরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, স্নেহময়ী হিন্দোলা ধুলি শয়ানে শায়িত, পার্শ্বে অনাথ বালক বালিকা মাতৃরোদনে রোরূদ্যমান। সেই পুরাতন ভৃত্যের নামহলধর। হিন্দোলাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া হলধরের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, শোক সিন্ধু উথলিয়া—ইন্দুভুষণের প্রেমচ্ছবি হৃদয়ে উপজিত হইল। তাহার শোক সন্তপ্ত মুখ দেখিয়া পাছে হিন্দোলা অধিকতর কাতর হয়; পাছে শোকাবেগে হিন্দোলা মূর্চ্ছিতা হয়, সেজন্য হৃদয়ের ক্লেশ হৃদয়ে চাপিয়া, প্রাণের

আবেগ প্রাণে চাপা দিয়া, নয়নের জল নয়নে মুছিয়া মৃদুস্বরে হলধর কহিল "হিন্দোলা! অমঙ্গল করিতে নাই কাঁদিও না।"

হিন্দোলা হলধরকে দাদা বলিয়া ডাকিত, হলধর তাহাকে বুঝাইলে হিন্দোলা কতক্ষণ পরে বলিল,

"দাদা! কান্না পায় কি করি?"

হলধর! আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া সেই আচলে কোমর বাঁধ।"

হিন্দোলা। "আঁচল ভিজিয়াগিয়াছে মুছিবার স্থান নাই।"

একথায় হলধরের নয়নযুগলে দরবিগলিত ধারা বহিল। হিন্দোলা দেখিতে না দেখিতে হলধর তাহা মুছিয়া ফেলিয়া কহিলেন—

"হিন্দোলা! বিপদে অধীর হইতে নাই, তুমি অধীর হইলে বালকেরা সারা হইবে, তুমি শান্ত হও, আমি চলিলাম, ইন্দু যেখানে থাকে তাহাকে না লইয়া ফিরিবনা; আমার মাথার দিব্য যতক্ষণ নাফিরি কাঁদিও না। এই চাবি গুলিন রহিল, সাবধানে রাখিবে, সংসারের ভার তোমায় দিয়া চলিলাম, দেখিও সকল দিক হারাইওনা। আমি শীঘ্রই ফিরিব। আমার না আসা পর্য্যন্ত কাঁদিওনা। রেখা ও চপলা রহিল, তাহাদের কাঁদাইওনা।" এই বলিয়া হলধর চাবির থোলোটী হিন্দোলাকে অর্পণ করিয়া ইন্দুভূষণের অনুসন্ধানে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। হিন্দোলার পুত্র কন্যার নাম ইন্দুরেখা ও সৌদামিনী-চপলা। ইন্দুভূষণ আদর করিয়া রেখা ও চপলা বলিয়া ডাকিতেন, সকলেই তাহাদের তাই রেখা ও চপলা বলিয়া ডাকিত।

হলধর বাটী হইতে বাহির হইয়া ক্রমাগত উত্তর দিকাভিমুখে চলিলেন, কারণ দক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান হইয়াছে।

হিন্দোলা হলধরের বাক্যে অতিশয় মান্য করিতেন। তাহার উপদেশে কথঞ্চিত হৃদয়াবেগ শমিত করিয়া, অবোধ শিশুগণের মুখ চুম্বন করিয়া, তাহাদের কিছু আহার করাইয়া, আবার সেই প্রাণের পুতলিদিগকে বক্ষে স্থাপন করিয়া, শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সে কক্ষে যাহা দেখেন, তাহাই ইন্দুভূষণের। রৌপ্য খচিত মনোহর কারু কার্য্য সমন্বিত বিচিত্র পর্য্যঙ্ক, মসৃণ নীল

মখমলের শয্যা, সুবর্ণ মুখনল সম্বলিত সুন্দর সুদীর্ঘ নলযুক্ত রৌপ্য নির্ম্মিত আলবোলা। বহুমূল্য হীরকাদি খচিত জরীর পাদুকা, সকলই ইন্দুভূষণের। হিন্দোলা কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই বিচিত্র শয্যা শূন্য দেখিলেন, তাঁহার হৃদয় কাঁপিল, জগৎ সংসার শূন্যময় দেখিলেন, প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার জন্য শিশুদ্বয়কে শয্যার উপর স্থাপিত করিলেন। ধীরে ধীরে জরীর জুতা জোড়াটী কোমল করে উঠাইলেন, ধীর বিকম্পিত করে বক্ষে স্থাপন করিলেন—শান্তি হইল না। মস্তকে রাখিলেন—মস্তকে রাখিয়া তৃপ্তি হইল। নয়ন মুদিয়া ইন্দুভূষণের আকৃতি ধ্যান করিলেন! হৃদয়াসন শূন্য দেখিলেন। ইন্দুভূষণের সুন্দর ছবি হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না, হৃদয় যেন তমসাচ্ছন্ন, যেন হৃদয় মুকুরে আর কিছুই প্রতি বিম্বিত হয় না। ইন্দুভূষণের ছায়া হৃদয়ে পতিত হয়—হয়—হয় না—যেন ইন্দুভূষণ নাই—যেন হিন্দোলাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াগিয়াছেন—যেন এজনমে আর ফিরিবেন না—যেন ইন্দুভূষণ ত্যাগী পুরুষ—দিব্য জটাভার মস্তক আচ্ছন্ন করিয়া লম্বিত হইয়াছে—সর্ব্বশরীরে বিভূতি মাখা—গলায় রুদ্রাক্ষ মালা—কপালে ত্রিপুণ্ড্রক—পরিধান কৌপীন বসন—দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল—বামহস্তে কমণ্ডলু—যেন জলন্ত দেব মূর্ত্তি। হিন্দোলার নয়ন মন সেরূপে পরিতৃপ্ত হইল, কিন্তু বিষের দারুণ জালায় যেন হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল—যেন আজ হিন্দোলা এ ভীষণ সংসারে অনাথ! আর এক বিন্দু অশ্রুজল হৃদয়োত্তাপে বিগলিত হইয়া, নয়ন প্লাবিত করিয়া, গণ্ডদেশে প্রবাহিত হইল। এবার তাঁহার দৃষ্টি কক্ষ দেওয়ালে স্থাপিত হইল। দেয়ালে ইন্দুভূষণের পূর্ণাকৃতি প্রতি মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল, অমনি তাঁহার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি মনে সুস্পষ্ট জাগরূক হইল—পশ্চাতে বাবরি কাটা সেই কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম—সেই সুতীক্ষ্ণ ধীশক্তির পরিচায়ক প্রশস্ত ললাট—সেই আকর্ণ বিশ্রান্ত প্রেমে-মাখা নয়ন যুগল—সেই যুগ্মভ্রূরাজি—সেই মৃদুমন্দহাসি রঞ্জিত মুকুতাসম দশন পঙ্‌ক্তি—সেই নাতি দীর্ঘ গ্রীবা—সুন্দর কান্তি—সেই চম্পককলিকা সদৃশ অঙ্গুলি শ্রেণী, সকলই একে একে হিন্দোলার মনে উপজিত হইল। হিন্দোলা গলিয়া গেল—বিভোর হইল—তাঁহার অকপট প্রেম—বিশুদ্ধ স্বভাব উন্নত প্রকৃতি—

ধর্ম্ম পূরিত সাধু উপদেশ—তমবিরহিত আচরণ—শিশু সন্তানের প্রতি গভীর স্নেহ, যুগপৎ সরলা বালিকার হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নিতান্ত কাতর ও সাতিশয় অধীর করিল। দিনের পর দিন গেল হলধর ফেরেনা—অষ্টাহ কাটীয়া গেল হলধর এখনো ফিরিলনা দেখিয়া, হিন্দোলা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন; শেষে গোপনে বাটীর বহির্গত হইয়া স্বয়ং স্বামীর অনুসন্ধানে যাইবেন স্থির করিলেন। কিন্তু কি করিয়া অনাথ শিশুগুলিকে ফেলিয়া যাইবেন? তাহারা কাহার নিকট থাকিবে, কে তাহাদের সময়ে আহার দিবে, কাহার নিকট তাহারা নিদ্রা যাইবে? মা বলিয়া কাঁদিলে কে তাহাদের কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিবে? সেই দীন হীন বালকেরা কাহার কাছে দাঁড়াইবে, এই ভাবনায় তাঁহার যাওয়া বন্ধ হইল। ভাবিলেন যদি হলধর থাকিত, তাহার কাছে রাখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তাহাদের তত কষ্ট হইত না। ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল, ক্রমে মনঃক্লেশের—বিরহ বেদনার—ততই হ্রাস হইয়া আসিল। একপক্ষ অতীত হইল, হলধর ফিরিলনা; হিন্দোলা ও সেই এক পক্ষের মধ্যে অনেক শান্ত হইয়াছেন—তিনি ও পাষাণে বুক বাঁধিতে পারিয়াছেন। এখন এক একটু গৃহকার্য্যে মন দিতেছেন, সং-সারেও কথঞ্চিত্ মন দিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে বিষয় কর্ম্মাদির সংবাদ ও লইতেছেন। দুটী শিশুর মুখ চাহিয়া হিন্দোলা আবশ্য সংসারে নামিয়াছেন, নিজে আহার না করিলে তাহারা আহার করেনা, সুতরাং দগ্ধোদরে একমুষ্টী প্রদান করিয়া থাকেন। প্রথমে দিবা রাত্র শয়ন করিয়া ক্রন্দন করিতেন, তাহা দেখিয়া বালকেরা মাতার বক্ষে শয়ন করিয়া কাঁদিত, তাই হিন্দোলা বালকদের সম্মুখে আর রোদন করেন না; অন্যমনস্ক থাকিবার জন্য তাই গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতে আরম্ভ করিলেন। শিশুদ্বয় হিন্দোলার সংসার বন্ধনের স্তম্ভী স্বরূপ হইল। তবে কালে হিন্দোলা কি ইন্দুভূষণকে ভুলিবেন? পতিব্রতা, স্বামী গত প্রাণা হিন্দোলা সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত। স্বামীর সহিত চীরবসনে বিজন বনে বাস করিয়া দিনান্তে শাকান্ন ভক্ষণেও হিন্দোলা সুখি, তথাপি পতি বিরহে বিচিত্র অট্টালিকায় বাস করিয়া, দুগ্ধফেণনিভ কোমল শয্যায় শয়ন করাও তাঁহার পক্ষে বিষবৎ। এজন্যে

হিন্দোলা কি ইন্দুভূষণকে ভুলিবেন? কথনই নহে। হিন্দোলা স্বামীকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করত মনে মনে ভক্তি কুসুমে পূজা করিতেন, এক্ষণে নয়নাশ্রু গাঙ্গবারিতে ভক্তি কুসুম প্রোক্ষিত করিয়া উদ্দেশে স্বামির চরণযুগলে অর্পণ করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ইন্দুভূষণের সংসারে রমেন্দ্র বলিয়া তাঁহার এক আত্মীয় চাকরী করিতেন! রমেন্দ্রের পিতার সহিত ইন্দুভূষণের পিতার নৈকট্য সম্বন্ধ ছিল। রমেন্দ্রের পিতা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। পুত্র কন্যা লইয়া তাঁহার চার পাঁচটী অপত্য ছিল। পরিবার প্রতিপালন করা তাঁহার পক্ষে ভার হইয়া উঠিয়াছিল, দীনতা বশতঃ কোন দিন একসন্ধ্যা অন্ন যুটিত কোন দিন যুটিত না; তথাপি ধনী আত্মীয়ের নিকট গমন করিয়া স্বীয় অবস্থা তাঁহাকে জ্ঞাত করিতে নিতান্ত অপমান জ্ঞান করিতেন। কাল সহকারে রমেন্দ্রের পিতার মৃত্যু হইলে রমেন্দ্রের মাতা নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িলেন, অপগণ্ড বালক বালিকা লইয়া কোথায় যান, কি করিয়া তাহাদের প্রতিপালন করেন, এই ভাবনায় নিতান্ত কাতর হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র রমেন্দ্রকে ইন্দুভূষণের পিতার নিকট পাঠাইলেন। তখন রমেন্দ্রের বয়ঃক্রম প্রায় ষোড়শ বৎসর হইবে। সেই দীন হীন নিঃসম্বল বালককে দেখিয়া ইন্দুভূষণের পিতার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। ইন্দুভূষণের

পিতা অতিশয় কৃপণ স্বভাব ছিলেন। তাঁহার পিতৃপুরুষের নষ্টপ্রায় বৈভব তিনিই পুণরুদ্ধার করিয়া যান, সুতরাং কৃপণ না হইলে ধন সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। কৃপণ স্বভাব হইয়া ও ইন্দুভূণের পিতা আত্মীয়ের দুঃখ দেখিয়া দয়াদ্র চিত্ত হইলেন, এবং রমেন্দ্রকে কহিলেন "সংসার প্রতি পালনের জন্য তোমার মাতাকে দশটী করিয়া মুদ্রা প্রদান করিব, এবং তুমি আমার সংসারে থাকিয়া বিষয় কর্ম্ম শিক্ষা কর, যতদিন শিক্ষা সমাধা না হয় ততদিন তুমি দশটাকা করিয়া বেতন পাইবে; শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তোমাকে আমার সংসারে কোন কার্য্যের ভার দিব।" রমেন্দ্র এই আশ্বাস বাক্যে স্বর্গ হস্তে পাইলেন; জগদীশ্বরের ইচ্ছায় তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হইল! ইন্দুভূষণের পিতা রমেন্দ্রকে সামান্য অর্থ প্রদান করিয়া আপাতত বিদায় দিলেন। রমেন্দ্র বাটীতে যাইয়া মাতাকে সমস্ত যথাযথ নিবেদন করিলেন, রমেন্দ্রের মাতা আনন্দিত হইলেন। এই দুঃসময়ে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় সহায় পাইয়া কুজ্ঝটিকাময় রজনীতে পথহারা নাবিকের ন্যায় ধ্রুবতারা দর্শন করিয়া পরমানন্দিত হইলেন। রমেন্দ্র সংসারের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সত্বর মুর্শিদাবাদে ইন্দুভূষণের পিতার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং উৎসাহ সহকারে জমিদারীর কার্য্য কর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিলেন। রমেন্দ্র বালক কাল হইতেই চতুর ছিলেন, সুতরাং শিঘ্রই বিষয় কার্য্যে পারদর্শী হইয়া ইন্দুভূষণের পিতার প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন। সুতীক্ষ্ণ মেধাবী ও চতুরতা গুণে কতিপয় বৎসরে রমেন্দ্র এরূপ ভাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন যে ইন্দুভূষণের পিতার সংসারের কর্ম্মচারীগণ ভীত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে সেই রাজসংসারে রমেন্দ্রের প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মচারীগণ তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া উঠিল, যদি ও তিনি প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন না, তথাপি তাঁহার কূট বুদ্ধিতে সকলেই পরাস্ত হইয়াছিল; কর্ত্তাবাবুর নিকট তাঁহার প্রতিপত্তি দেখিয়া এমনকি প্রবীণ দেওয়ানজী অবধি তাঁহার নিকট সশঙ্কিত থাকিত। জমিদার সরকারের কর্ম্মচারীগণ স্বভাবতঃ লুব্ধ। লোভ পরতন্ত্র হইয়া সময়ে সময়ে তাহারা প্রভুকে বিশেষ ক্ষতি গ্রস্থ করিতে ও প্রস্তুত হইত। একা দুরভিসন্ধি পূর্ণ হয় না, তজ্জন্য তাহারা দলবাঁধিয়া সমস্ত কার্য্য করিত, সেই জন্য

ভারতের রাজ সংসারে এত চক্রান্ত—এত ষড়যন্ত্র—তাই সৎস্বভাবের লোকে রাজ সংসারে প্রতিষ্ঠা পায় না—তাই বিশুদ্ধভাবে থাকিয়া প্রতিপত্তি লাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। রাজাবাবুর আত্মীয় বলিয়া প্রথমে রমেন্দ্রকে রাজ সরকারের কর্ম্মচারীগণ বিশ্বাস করিয়া আপনাদের গূঢ় মন্ত্র তাহার নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইত না, পাছে রমেন্দ্র তাহাদের দুরভিসন্ধি রাজাবাবুর নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়। কিন্তু চতুর রমেন্দ্র নিজ বুদ্ধিমত্তাবলে সকল ষড়-যন্ত্র ভেদ করিয়া সত্বর তাহাদের অগ্রণী হইয়া উঠিলেন। কোন মহলের প্রজাগণ ভূম্যাদি কিম্বা খাজনা সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিতে আসিলে অমনি তাহাদের গোপ-নে ডাকিয়া গোপনে কহিয়া দিতেন "কাহার ও সহিত বন্দোবস্ত করিলে তাহা চূড়ান্ত হইবে না, অথচ তাহারা ফাঁকি দিয়া অর্থ লইবে, কারণ রাজাবাবুর নিকট গমন করা তাহাদের সাধ্যাতীত"। কোন ধনী পত্তনীদার খাজনার দায়ে বিপন্ন, দেওয়ানজী অর্থলোভে বহুদিন চেষ্টা করিয়া শেষে তাহাকে আপন কায়দায় ফে-লিয়াছেন, আজ সেই পত্তনীদার বন্দোবস্তের জন্য রাজ-বাটীতে উপস্থিত, রমেন্দ্র অমনি গোপনে যাইয়া কলকাটী নাড়িয়া দিয়া গোপনে বলিয়া দিলেন "রাজা-বাবু দেওয়ানজীর কার্য্যে সন্তুষ্ট নহেন; তাঁহার উপর রাজাবাবুর অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, সুতরাং তাঁহা দ্বারা যে বন্দোবস্ত করিবেন, তাহা পরিণামে টেঁকিবে না"। কোন গোমস্তা বাহাল হইবে, তাহার বাহালি পরোয়ানা বাহির করিয়া দিতে হইবে, কর্ম্মচারী দক্ষিণা লইয়া যথানিয়মে দরখাস্ত পেশ করিয়া বসিয়া রহিল। রমেন্দ্র ও চাতুর্য্যের সহিত সেই দরখাস্ত সরাইয়া রাখিলেন, কর্ম্ম প্রার্থী দিন গণিতে লাগিল, তাহার দরখাস্তের আর হুকুম হয় না। রমেন্দ্র তাহাদের লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ হাসিয়া মস্তক নত করিয়া গম্ভীর চালে চলিয়া যাইলেন, শেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া আবেদনকারী তাঁহারই শরণাপন্ন হইলেন। কর্ম্মচারীগণ অভীষ্ট লাভে উপর্য্যুপরি বঞ্চিত হইয়া রমেন্দ্রকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিয়া লইলেন। রাজাবাবুকে রমেন্দ্র গোপনে দুএক কথা কহিতে সমর্থ বুঝিয়া তাহারা তাঁহাকেই কর্ত্তা বলিয়া মানিতে লাগিল! দেওয়ানজী, নামে দেওয়ানজী রহিলেন, ফলতঃ রমেন্দ্রই রাজ-বাটীতে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। রমেন্দ্রের পডতা পড়িয়া

গিয়াছে, গরিবের সন্তান অল্পদিনে বহুলঅর্থ সঞ্চয় করিয়া ফেলিলেন। রমেন্দ্রের আবাস মুর্শিদাবাদ জেলায়, খড়গ্রামে। তাঁহার পৈতৃক বাসবাটী সামান্য পর্ণকুটীর মাত্র ছিল, অল্পদিনের মধ্যে সেই পর্ণকুটীর বিস্তৃত অট্টালিকায় পরিণত হইল। ইতি পূর্ব্বে রমেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এবং একটী পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। রমেন্দ্র স্বদেশে অনেক বিষয় সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন; এক্ষণে রমেন্দ্র একটী ক্ষুদ্র জমীদার বিশেষ। এরূপ বিষয় বিভবশালী হইয়াও রমেন্দ্রের ধনআশা তৃপ্ত হয় নাই, বরঞ্চ অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। রমেন্দ্রের এমন সময় গিয়াছে, যখন একটী রৌপ্য মুদ্রা তাঁহার পক্ষে এক লক্ষ মুদ্রা-সম ছিল, কিন্তু সেই রমেন্দ্র লক্ষপতি অপেক্ষা অধিক ধনশালী হইয়াও আজ তাঁহার আশা মেটে নাই। তাঁহার মাতা এখন ও রাজাবাবুর নিকট সেই দশটী করিয়া টাকা বৃত্তি লইতেছেন, তাহাতেই তাঁহার এক প্রকার গুজরাণ হইতেছে, কারণ রমেন্দ্র ধনশালী হইয়া স্বীয় মাতা ও সোদর অপগণ্ড ভাই ভগ্নি গুলিকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন। তাহারা যে দীন, সেই দীন ভাবেই কাল যাপন করিতেছে, সুতরাং রমেন্দ্রের মাতার মাসহারার সেই দশ টাকাই তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়।

দিন সমান যায় না, দারুণ শীতের পর, সুখ বসন্তান্তে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম উপজিত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে ছয় ঋতুর উপভোগ হয়।

চক্রের ন্যায় দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ প্রতি নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জগতে সকলই পরিবর্ত্তনশীল—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় মাত্রেই অনিত্য-অস্থির।

রমেন্দ্রের দুঃখের পর সুখ আসিয়াছিল, আবার সুখের অবসান হইয়া আসিল।

ইন্দুভূষণের পিতার সহসা মৃত্যু হইল, রমেন্দ্রের সুখসূর্য্য অস্তোন্মুখ হইয়া আসিল। বড় রাজাবাবুর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে রাজসংসারে রমেন্দ্রের প্রতি-পত্তির খর্ব্বতা হইয়া আসিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় রমেন্দ্রের মাতার মাসিক বৃত্তিটী বন্ধ হইল। ইন্দুভূষণ কহিলেন "তাহার পুত্র দশটাকা উপার্জ্জন

করিয়া গুছাইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে আর তাঁহার মাসিক বৃত্তি রাজভাণ্ডার হইতে দিবার আবশ্যক নাই। রমেন্দ্র স্বচ্ছন্দে তাহার মাতার ভরণপোষণ ও শিশু ভাই ভগ্নিগুলির প্রতিপালনে সমর্থ"।

আজকয়মাস হইল, রমেন্দ্রের মাতার বৃত্তি বন্ধ হইয়াছে, দুই একমাস কাল রমেন্দ্র ইন্দুভূষণের ভয়ে তাহার মাতার গ্রাসাচ্ছাদন কথঞ্চিৎভাবে কুলান করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহা ও বন্ধ করিলেন। রমেন্দ্রের মাতা উপায়ান্তর না দেখিয়া আত্মীয়-বাটীতে স্বীয় উদ্যারান্নের জন্য উপস্থিত হইলেন। রাজসংসারের কর্ম্মচারীগণ কোন সূত্রে তাহা অবগত হইয়া, তাহাদের পুরাতন পূর্ব্বসঞ্চিত বৈর সাধনের সময় পাইয়া—একত্র সমবেত হইল, এবং রমেন্দ্রকে অপদস্থ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়া তাহার মাতাকে ইন্দুভূষণের নিকট উপস্থিত করাইল। রমেন্দ্রের মাতা ইন্দুভূষণের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল "কি অপ-রাধে নিঃসহায়া আত্মিয়কন্যার মাসহারা বন্ধ হয়"? ইন্দুভূষণ আত্মিয়-কন্যাকে রাজ দরবারে উস্থিত দেখিয়া কিছু অপ্রতিভ হইলেন এবং কহিলেন "কোন অপরাধে বন্ধ হয় নাই, ন্যায় বিচারে বন্ধ করিয়াছি"।

রমেন্দ্রের মাতা। "রাজসংসারের মাসহারাই, অসহায়া বিধবার জীবনধারণের একমাত্র উপায়ছিল, তাহা বন্ধ করিয়া কি ন্যায় বিচার হইল"?

ইন্দুভূষণ। "রাজভাণ্ডারের দুই মুখ দিয়া অর্থ বাহির হইতেছিল একটী মুখ অবরোধ করা হইল"।

রমেন্দ্রের মাতা। "তাহাতে রাজভাণ্ডারের বিশেষ কি উপকার সাধিত হইল"?

ইন্দুভূষণ। "বিশেষ না হউক, কথঞ্চিৎ হইয়াছে বটে"।

এই সময় দেওয়ানজী বলিয়া উঠিলেন "মহারাজ! কথা না কহিয়া থাকিতে পারাযায়না তাই কহিতেছি, দুইটীর মধ্যে প্রবল মুখটী রুদ্ধ করিলে রাজ-সংসারের উপকার সাধিত হইত"।

ইন্দুভূষণ। "প্রবল মুখ অবরোধে পূর্ণ জলাশয় শুষ্ক হইত"।

দেওয়ানজী। "যে পয়নালীর জল যোগে যায় তাহা অগ্রেবন্ধ করিতে হয়,

কিন্তু স্রোতস্বিনীর মুখ অবরোধ করিলে বহু লোক বিশুদ্ধ জলে বঞ্চিত হইয়া রোগাক্রান্ত হয় এবং অকালে প্রাণত্যাগ করে"।

ইন্দুভূষণ। "কোনটী পয়নালী এবং কোনটীই বা ঘোগ্ তাহা বুঝিলাম না"।

দেওয়ানজী। "যাহাতে বহু লোক প্রতিপালিত হয়, সেইটীই ঘোগ্"।

ইন্দুভূষণ। "এখানে কেবা ঘোগ এবং কেইবা পয়নালী"?

দেওয়ানজী। "রমেন্দ্র ঘোগ, তাহার মাতা পয়নালী"।

ইন্দুভূষণ। "রমেন্দ্রের সমবেত সংসার পূর্ণ জলাশয়। একা রমেন্দ্রের উপায়ে সকলেই প্রতিপালিত হইতে সক্ষম, কিন্তু স্ত্রীলোকের সামান্য মাসহারাতে কয়টী পরিবার প্রতিপালিত হইতে পারে"?

দেওয়ানজী। "রমেন্দ্র স্বীয় উপার্জ্জনে ধনী হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার মাতা ও তাহার অপগণ্ডভ্রাতাগণ উদরান্নের জন্য লালায়িত, রমেন্দ্রের স্ত্রীর দয়ার মুখাপেক্ষী"।

ইন্দুভূষণ। রমেন্দ্র কি তাহাদের প্রতিপালন করে না"?

দেওয়ানজী। "রমেন্দ্রের মাতা উপস্থিত, সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করুণ"।

রমেন্দ্রের মাতা নিতান্ত কষ্টেই পুত্রের নিন্দাবাদ প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইল, এবং রোদন স্বরে কহিল, "দশটী টাকা মাসহারাই আমাদের চারটী লোকের জীবনধারণের উপায়, মাসহারার টাকা ফুরাইয়াছে, রমেন্‌কে সাহায্যের জন্য পত্র লিখিয়াছি, তাহার উত্তর পাইনাই। নিজে অনাহারে বুকে হাত দিয়া পড়িয়া থাকিতে পারি, কিন্তু যখন জঠর-জ্বালায় শিশুগণ কান্নাররোল তুলিয়া আমাকে অস্থির করিত, তখনই বউমার নিকট একমুষ্টি চাল ডাল কিম্বা অর্থ সাহায্যের জন্য ভিকারিণীরমত যাইতাম, বউমা অম্লান মুখে আমাকে ফিরাইয়া দিতেন। মলিন, ছিন্ন, শত গ্রন্থি দেওয়া বস্ত্র পরিয়াছি, রমেন্দ্র স্বচক্ষে দেখিয়াও দেখেন নাই। রমেন্দ্রের শাশুড়ি গরদের সাটী আটপৌরে পরিতেন, তথাপি আমাকে একখানি সুতার বস্ত্র দিতে তাঁহার কষ্ট হইত। রমেন্দ্রের ছেলেরা ভাল ভাল পোষাক পরিত, আমার ছেলেরা তাই দেখে কাঁদিত, রমেন্দ্র ও বৌমা তাহা দেখিয়া হাসিতেন-ব্যঙ্গ করিতেন। প্রতিবাসীরা আমার দুঃখে দয়াদ্র হইয়া

সাহায্য করিত, কিন্তু রমেন্ কি বউমা মুখের কথায় ও একবার জিজ্ঞাসা করিতেন না। রমেন্ পৃথক বাটী প্রস্তুত করিয়া আমাদের পৃথক্ করিয়া দিলেন। আমরা ভাঙ্গা ঘরে বাস করিতে লাগিলাম, বৃষ্টি হইলে মাথা রাখিবার স্থান থাকেনা, রমেন্ অট্টালিকায় সুখে বাস করিতেছেন "।

ইন্দুভূষণ। "আপনি কি বলিতেছেন! এ যে নিতান্ত অস্বাভাবিক! যে মানুষের হুঁষ নাই সে মনুষ্যপদবাচ্য নহে। মানব প্রকৃতিতে পৈশাচিক বৃত্তির এত আধিক্য সম্ভব কি না স্বপ্নেও জানিতাম না। অর্থসঞ্চয় ব্যয়ের জন্য, এবং পরোপকারার্থ। যে সন্তান পিতৃ মাতৃ সেবায় বিমুখ-যাহার অর্থ পিতামাতার সেবায় ব্যয়িত হয় না, তাহার জীবনে ধিক্"!

রমেন্দ্রের মাতা। "সেবা করা দূরে থাক গুণধর পুত্র আমাকে প্রহার পর্য্যন্ত করেছেন"।

ইন্দুভূষণ। "আর না যথেষ্ট হইয়াছে, দুঃখের কথা আর শোনা যায় না, আজ থেকে রাজসংসারে ১৫ টাকা করিয়া তোমার মাসহারা বরাদ্দ হইল, রমেন্দ্র পাঁচ টাকা করিয়া কম বেতন পাইবে"।

কর্ত্তাবাবুর আদেশে রমেন্দ্রের মাতার সেই দিনাবধি রাজসংসারে ১৫ টাকা করিয়া মাসহারা বরাদ্দ হইল। তিনি আনন্দিত হইলেন এবং হৃদয় ভরিয়া ধন্যবাদ করিয়া দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং কর্ত্তাবাবুর আদেশ মত অন্দরে গমন করিলেন।

রমেন্দ্রের অর্থাগমের ন্যূনতার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুভূষণের কর্তৃত্ব সময়ে তাহার প্রতি পত্তির ও লাঘব হইয়া আসিল। ইন্দুভূষণ রমেন্দ্রের ব্যবহারে তাহাকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। রমেন্দ্র ইন্দুভূষণের সংসারে এক প্রকার জীবিতে মৃতবৎ কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রমেন্দ্রের ক্রোধবহ্নি নির্ব্বাপিত হইবার নহে—ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিবৎ হৃদয়ে প্রধূমিত হইতে লাগিল—অনলশিখা কেহ দেখিতে পাইলনা, বাহিকে ইন্দুভূষণের অনুগত ভৃত্যের ন্যায় থাকিয়া রাজসংসারের—কর্ম্মচারিগণের নিতান্ত অনুগত থাকিয়া সদ্ভাবের সহিত কালাতিপাৎ করিতে লাগিলেন। অসময় দেখিয়া রমেন্দ্র উন্নত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় মেঘ

সংঘর্ষণ, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ও দারুণ বজ্রাগ্নি বুক পাতিয়া সহ্য করিলেন। প্রতিক্ষায় রহিলেন সুযোগ পাইলে একদিন না একদিন ইহার প্রতিশোধ লইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জগত কি পরিবর্ত্তনশীল! দেবতার কি দেবলীলা! দুঃখ চিরকাল সমভাবে থাকে না। দুঃখরূপ তামসী নিশা অস্তমিত হইয়া আবার সুখসূর্য্য উদিত হয়। গ্রহগণ রাশী চক্রে পরিবর্ত্তিত হইয়া মানবগণকে সুখদুঃখভাগী করে। সৌভাগ্য ক্রমে রমেন্দ্রের কুগ্রহ অন্তর্হিত হইয়া সুভগ্রহ সমুদিত হইল। রমেন্দ্রের সেই সুসময় দূর নহে অতি নিকটে সমুপস্থিত হইল, প্রতিশোধ লইবার সুযোগ আসিল, ইন্দুভূষণ সংসার ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজ-বাটীতে হাহাকার পড়িয়া গেল, ইন্দুভূষণের অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত লোক প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইল। রমেন্দ্র মনে মনে আনন্দিত হইলেন, এতদিনে তাঁহাব বৈরনির্য্যাতন-কাল সমুপস্থিত হইল। রমেন্দ্র সে আনন্দ প্রকাশ করিলেন না, গুপ্তভাবে হৃদয়ে পোষিত রাখিলেন। অন্যান্য সরকারী কর্ম্ম-চারীগণ প্রভুর অনুদ্দেশে যেরূপ বিপন্নভাবে ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, বাহ্যে রমেন্দ্র ও সেই রূপ কাতর ভাবে তাঁহার অনুসন্ধানে ব্যস্ততা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু হৃদয়ে যে প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা নির্ব্বাপিত হইবার নহে, গোপনে প্রধূমিত হইয়া গোপনে হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল। এক একটি পূর্ব্ব স্মৃতি, পূর্ব্বাবমাননা, হৃদয়ে জাগরূক হইয়া প্রতিহিংসানল-শিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়াদিল। রাজ কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক

তাঁহার মাতার রাজদরবারে উপস্থিত, তাঁহার বিরুদ্ধে ইন্দুভূষণের নিকট আবেদন প্রভুর সমক্ষে তাঁহার নিন্দাবাদ, এবং তাহার বিরুদ্ধে ইন্দু-ভূষণের আদেশ প্রচারও তদবধি তাঁহার প্রতি ইন্দুভূষণের অভক্তি সঞ্চার যুগপৎ হৃদয়ে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিতান্ত কাতর করিল। এক্ষণে সময় পাইয়া সেই প্রতিহিংসার প্রতিশোধ লইবার সুযোগ পাইলেন।

অসহায়া অবরোধবাসিনী হিন্দোলাই এক্ষণে বৃহৎ রাজসংসারের একমাত্র কর্ত্রী। রমেন্দ্র ভিন্ন কর্ম্মচারীর মধ্যে তাঁহার আর অন্য নিকট আত্মিয় নাই, এবং কর্ম্মচারীগণের মধ্যে রমেন্দ্র ভিন্ন আর কাহার ও অন্তঃপুর প্রবেশের অধিকার নাই, সুতরাং রাজসংসারে রমেন্দ্রের পুণরাধিপত্য সংস্থাপনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। দেওয়ানজী প্রমুখ কর্ম্মচারীগণ আতঙ্কিত হইলেন, আবার বুঝি রমে-ন্দ্রের পাশা পড়িয়া আসে। একবার কচেবারো মারিতে পারিলেই রমেন্দ্রের এ বাজী জীত হইবে, রমেন্দ্র হস্তে পাশা লইয়া ক্ষেপণে উদ্যুক্ত। রমেন্দ্র সময় বুঝিয়া হস্তস্থ পাশা ক্ষেপণ করিবেন, সুতরাং সেই সময়েরই প্রতীক্ষা করিতে-ছেন। অষ্টাহ কাটিয়া গেল, রাজকর্ম্ম বন্ধ রহিয়াছে, হিন্দোলা এখনও নিতান্ত অধীর। সামান্য আদেশাদি প্রদান দেওয়ানজী দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইতেছে। কর্ত্রীঠাকুরাণী নিতান্ত অধীর বলিয়া দেওয়ানজী রাজকার্য্য সম্বন্ধে কোন কথাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন না। হলধর ইন্দুভূষণের অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইবার পূর্ব্বে গোপনে বলিয়া গিয়াছিলেন, "যতদিন আমি না ফিরি, অধীর হইওনা। আপাততঃ দেওয়ানজীই রাজকার্য্য চালাইবেন, তাঁহার কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিওনা, আর কাহাকে ও তাঁহার উপর কর্তৃত্ব করিবার আদেশ দিওনা, দেওয়ানজী পুরাতন ভৃত্য, নেমকের চাকর, বিশেষতঃ বিশ্বাসী ও প্রাচীন ব্যক্তি, রাজাবাবু তাঁহাকে বড় বিশ্বাস করিতেন ও ভাল বাসিতেন"। হলধরের প্রস্থানের পর হিন্দোলা অল্প প্রকৃতিস্থ হইয়া ও তাহারই কথামত দেওয়ানজীর কার্য্যে হস্ত ক্ষেপণ করিলেন না, রাজ-কার্য্য পূর্ব্বমতই চলিতেছে। কেবল গুরুতর আদেশ প্রচার বন্ধ রহিয়াছে মাত্র। রমেন্দ্র ভাবিতেছেন কর্ত্রীঠাকুরাণী তাঁহাকে অন্তঃপুরে ডাকিবেন, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন।

ক্রমে কর্ত্রীর শোক প্রশমিত হইলে অন্দর মহলে ঘনিষ্টতা নিবন্ধন তাঁহার উপর বিশ্বাস জন্মিবে, এবং বিশ্বাস হইতেই ভালবাসা আসিবে। ইন্দুভূষণের অভাবে তিনিই রাজসংসারে এক সময় সর্ব্বেসর্ব্বা হইবেন, হিন্দোলার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবেন। একপক্ষ অতীত প্রায়, কৈ! হিন্দোলাতো তাঁহাকে অন্দরে ডাকিয়া তাঁহার সহিত, তো পরামর্শ করিলেন না? চলিত কার্য্য, তো পূর্ব্ববৎ দেওয়ানজীই নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহাতে, তো এখন ও ব্যত্যয় ঘটীলনা? তবেকি রাজ্ঞী এখন ও সুস্থ হন নাই বলিয়া রাজকার্য্যের অনুসন্ধান লইতেছেন না? রমেন্দ্র অন্দরের দুই একটী অল্পবয়স্কা পরিচারিকার সাহায্যে রাজ্ঞীর দৈনন্দিন সংবাদ লইতে লাগিলেন, ক্রমে অবস্থা বুঝিয়া রাজকার্য্য সম্বন্ধে দুই এক কথা ও অন্দরে প্রবেশ লাভ করিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানজীর নামে দুএকটী নিন্দাবাদ ও অন্দরে পৌঁছিল। হলধরের উপদেশমতে হিন্দোলা সে কথায় অগ্রে কর্ণপাৎ ও করিলেন না, অনবরত বারিসন্নিপাতে কঠিন প্রস্তর ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সুকুমারমতি স্ত্রীলোকের, রাজকার্য্য সম্বন্ধে দেওয়ানজীর উপর যে সন্দেহ সঞ্জাত হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? কর্ত্রী দেওয়ানজীর চরিত্রের উপর সন্দিহান হইলেন বটে, কিন্তু রমেন্দ্রকে বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিল না। স্বীয় মাতার প্রতি কুব্যবহারে রমেন্দ্রের উপর তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল, রমেন্দ্র নীচমনা বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাই রমেন্দ্রকে অন্দরে ডাকাইয়া রাজকার্য্য সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সহজে প্রবৃত্তি হয় নাই, সুতরাং দেওয়ানজীই পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

এই সময় রমেন্দ্র স্বদেশ হইতে তাঁহার স্ত্রীকে আনাইয়া মুর্শীদাবাদস্থ বাসাবাটীতে রাখিলেন। যে সময় হিন্দোললতা স্বামীশোকবিহ্বলা ছিলেন, সেই সময় রমেন্দ্রের স্ত্রী আত্মীয়বধু বলিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণীকে শান্ত করিবার জন্য অন্তঃপুরে তাঁহার প্রবেশাধিকার ছিল। শোকাকুলা কর্ত্রীঠাকুরাণীকে সান্তনা করিবার ছলে, রমেন্দ্রের স্ত্রী প্রথমে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করেন। এই ভাবে হিন্দোললতার নিকট আনুগত্য করায় দুই চারিদিনে হিন্দোললতা রমে-ন্দ্রের স্ত্রীকে ভাল বাসিলেন। রমেন্দ্রের স্ত্রী চতুরা—স্বকার্য্যোদ্ধারে তৎপরা।

সুমিষ্ট সম্ভাষণে এবং সময়োচিত মধুর আলাপে, অল্পদিনের মধ্যেই হিন্দোলার শোক সন্তপ্ত হৃদয়কে কথঞ্চিত শান্ত করিলেন। শোককালিন হৃদয়োচ্ছাস যতই প্রকাশ করা যায় হৃদয়ের, আবেগ ততই প্রশমিত হইয়া আসে। শোকের সময় সমদুঃখ ভাগী পাইলে তাহাকে বড়ই ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে—যেন তার কাছে মনের কথা কহিয়া শান্তিলাভ হয়—তাহার সহিত যতই আলাপ করিবে তত যেন আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়—তার সহিত কি যেন প্রাণের সম্বন্ধ ঘটীয়া যায়—সে যেন হৃদয়ের লোক—প্রাণের লোক হইয়া যায়—যেন তার সহিত কথা কহিয়া হৃদয় জুড়ায়—শোকাগ্নি প্রশমিত হয়। রমেন্দ্রের স্ত্রীর নাম বিলা-সিনী। বিলাসিনীর সহিত কথাববার্ত্তায় হিন্দোললতার দিন কাটীতে লাগিল। ইন্দুভূষণের গৃহত্যাগের পর প্রায় একপক্ষ কাল হিন্দোলার দিবস রজনী ক্রন্দনেই কাটীত। প্রথম অষ্টাহ হিন্দোলা স্বামী শোক বিহ্বলা—জ্ঞান-হারা—উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে পুত্র, কন্যার মুখ চাহিয়া কথঞ্চিত বুক বাঁধিয়াছিলেন। এক্ষণে বিলাসিনীকে পাইয়া তাহার সহিত কথায়বার্ত্তায় কথঞ্চিৎ স্বামীবিরহ শোক ভুলিতে পারিয়াছিলেন। তাই হিন্দোলা বিলাসিনীকে বড় ভাল বাসিলেন—বিলাসিনীর কাছে থাকিলে ভাল থাকিতেন—রোদন ভুলিতেন—গৃহকার্য্যে কিছু কিছু মন দিতে পারিতেন। ক্রমে বিলাসিনী হিন্দোলার প্রাণের মানুষ হইয়া উঠিলেন। বিলাসিনী সমস্ত দিন হিন্দোলার নিকট কাটাইতে লাগিলেন। সমস্ত দিনেও হিন্দোলার কথা ফুরায় না। যতইকথা কহে ততই যেন কথা আসিয়া যুটে—ততই কথা কহিতে প্রবৃত্তি জন্মে—ততই মনের শান্তি হয়।

একমাস অতীত হইল, ইন্দুভূষণ ফিরিলেন না, হলধরের ও দেখা নাই। রমেন্দ্র মনে মনে চিন্তা করিলেন হলধর ইন্দুভূষণকে না লইয়া আসিবেনা, সেই জন্য তাহার অপেক্ষায় রহিয়াছে, দুএকদিনের মধ্যেই ফিরিবে। সেই দুইএক দিন ও কাটীয়া গেল, তাহার উপর আরও দুই চারিদিন কাটীল, ইন্দুভূষণ তথাপি ফিরিলেন না, হলধর ও তাঁহার সংবাদ লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয় না। যতই দিন যাইতেছে, রমেন্দ্র ইন্দুভূষণকে বাটী প্রত্যাগমন করিতে না দেখিয়া ততই

আনন্দিত হইতেছে। কিন্তু হলধরকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে না দেখিয়া মনে মনে আতঙ্কিত হইতেছেন। আশঙ্কা, পাছে হলধর ইন্দুভূষণকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। এদিকে যতই দিন যাইতেছে, হিন্দোলা ইন্দুভূষণকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে না দেখিয়া ততই কাতর হইতেছেন বটে, কিন্তু হলধর ফিরিতেছে না দেখিয়া মনে প্রবোধ মানিয়াছেন, হলধর তাঁহার সন্ধান না পাইলে এতদিনে ফিরিত। যখন হলধর প্রত্যাগমন করে নাই তখন হিন্দোলা ইন্দুভূষণের প্রত্যাগমনের আশা ত্যাগ করে নাই। তাই হিন্দোলা মনকে প্রবোধ দিয়াছেন, ইন্দুভূষণ ত্বরায় ফিরিবেন—তাই হিন্দোলা শান্ত—ভাবাপন্না—তাই সে বিলাসিনীর সহিত দুইটা মনের কথা কহিয়া মনকে ফিরাইয়া রাখিতে পারিয়াছে—তাই সে হৃদয় পুত্তলিগুলির দিকে চাহিতে পারিয়াছে। তাই এখনও সংসার পাতিয়া বসিয়া আছে—তাই এখনও পাগল হয়নাই। বিলাসিনী সময় বুঝিয়া স্বামীর পরামর্শানুসারে মধ্যে মধ্যে রাজ কার্য্য সম্বন্ধে দুএকটী কথা পাড়িয়া হিন্দোলার মন বুঝিয়া লইতেছেন এবং সুযোগক্রমে দেওয়ানজীর বিশ্বস্ততা ও কার্যদক্ষতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া রাখিতেছেন। সময় হইলে ছিন্ন মূল পাদপের ন্যায় আপনি সামান্য বাত্যায় পতিত হইবে। ক্রমে রাজকার্য্যের পরামর্শজন্য হিন্দোলা রমেন্দ্রকে অন্তঃপুরে ডাকাইতে লাগিলেন। শেষ খেলায় রমেন্দ্র রঙ্গের গোলাম হইয়া বিবি ধরিবার সুযোগে রহিলেন। ক্রমে রাজসংসারে রমেন্দ্রের প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইল। রাজ্ঞী রমেন্দ্রের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন আদেশ প্রচার করেন না। দুই একমাসের মধ্যে রমেন্দ্র আম্‌মোক্তারনামা বলে দুএকখানি করিয়া ভূমিসম্পত্তি আপনার নামে লেখা পড়া করিয়া লইতে লাগিলেন, এবং নূতন সম্পত্তি খরিদ করিতে হইলে নিজ নামেই খরিদ হইতে লাগিল। ক্রমে রমেন্দ্র নিজ নামেই আদেশাদি প্রচার আরম্ভ করিলেন। দেওয়ানজী প্রমুখ কর্ম্মচারীগণ দেখিলেন বিষয় যায় আর থাকেনা। এবার বুঝি রমেন্দ্রই রাজা হইয়া বসেন? কর্ম্মচারীগণ রাজ্ঞীকে রমেন্দ্রের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে সাবধান করা, না করা সমান ভাবিয়া তাঁহাকে কোন কথাই জানাইলেন না। রমেন্দ্রের প্রতিপত্তির কারণে

কুঠারাঘাত করিতে ষড়যন্ত্র করিলেন এবং গোপনে গোপনে ইন্দুভূষণ ও হলধরের অনুসন্ধানে লোক প্রেরিত হইল। কোন সামান্য কারণ উপলক্ষ করিয়া রমেন্দ্র স্বীয় স্ত্রীকে স্বদেশে নিজালয়ে প্রেরণ করিলেন। রমেন্দ্র রাজান্তঃপুরে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ গমনাগমন করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুর—বাসিনী জনৈক বিপথগামিনী চতুরা পরিচারিকাকে হস্তগত করিয়া রমেন্দ্র তাহারই সাহায্যে মনোরথ পূর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন। রমেন্দ্র অল্পদিনে প্রভূতধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া তৃপ্ত হইলেন না—ইন্দুভূষণের উপর তাঁহার প্রতি—হিংসানল নির্ব্বাপিত হয় নাই, অতি যতনে সে অনল হৃদয়ে রক্ষিত হইয়া প্রধূমিত হইতেছিল, ইন্দুভূষণের অনুপস্থিতিতে সেই প্রতিহিংসানল সহসা কুপ্রবৃত্তির সাহায্যে কুপথগামী প্রধাবিত হইবার জন্য প্রজ্জলিত হইল। রমেন্দ্র সরলা অসহায়া যুবতী হিন্দোলার কোমল হৃদয়রাজ্যাধিকারে উদ্যত হইলেন। সেই চতুরা পরিচারিকা মালতী তাহার সহকারিণী হইলেন। মালতীকে করায়ত্ত করিতে রমেন্দ্রকে অধিক প্রয়াস পাইতে হয় নাই। মালতী বিলাসিনীর প্রতিবেশিনী, উভয়ের পিত্রালয় একই স্থানে। অল্প-বয়সে বিধবা হইয়া মালতী পিত্রালয়ে বাস করিতেছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে অল্প-দিনের মধ্যেই তাহার পিতা মাতার মৃত্যু হইলে, সে নিতান্ত অসহায়া হয় এবং সমবয়স্কা বিলাসিনীর সাহায্যে রাজপ্রাসাদে হিন্দোলার পরিচারিকা রূপে নিযুক্ত হইয়া নিজ বুদ্ধিমত্তা-বলে অল্পদিনের মধ্যেই মালতী হিন্দোলার প্রিয় হইয়া উঠে। মালতী সৎগোপকন্যা হইলেও বিলাসিনীর স্বদেশীয়া ও সমবয়া বলিয়স্কা উভয়ের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। মালতী বিলাসিনীর স্ত্রীর সম্পর্কে গঙ্গাজল। সুতরাং রমেন্দ্র ও মালতীকে গঙ্গাজল বলিয়া ডাকিতেন। বালবিধবা মালতীর রমেন্দ্রের উপরি প্রেমলালসা ছিল, সে পিপাসার শান্তি হয় নাই, সেই বাল্যপ্রেমানুরাগ মালতীর হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। দিনের পর দিন যায় রমেন্দ্রের সকল কৌশল সমস্ত চাতুরী ব্যর্থ হইতে লাগিল, তথাপি রমেন্দ্র হিন্দোলার সতীত্বরূপ জ্বলন্ত বহ্নিতে ঝাঁপদিতে প্রস্তুত। ইন্দ্রিয় পরিচালিত রমেন্দ্র—কুপ্রবৃত্তির দাস রমেন্দ্র—আত্মহারা রমেন্দ্র—সতীত্বরূপ জ্বলন্ত বহ্নিতে দগ্ধ হইতে ধীরে

ধীরে পতঙ্গবৎ বহ্নি মুখে অগ্রসর হইলেন। রমেন্দ্রের পাপ লালসা পরিতৃপ্ত করিবার সহকারিণী পাপিয়সী মালতী ধীরে ধীরে হিন্দোলার পবিত্র মন ভুলাইতে লাগিলেন। দিনের পর দিন যায় মালতী সুযোগ পাইয়া উঠে না। সতীকে পাপমার্গে প্রবৃত্ত করা সহজ নহে, পাপ কথা তাহার নিকট প্রকাশ করিতে ও সহজে সাহস হয় না। একদিন নির্জ্জন দেখিয়া মালতী রমেন্দ্রের সৌন্দর্য্য লইয়া কথা পাড়িলেন, সে দিন সে কথায় হিন্দোলা কর্ণপাত ও করিলেন না। এইরূপ দুই চারিদিন করিতে করিতে হিন্দোলা মালতিকে ইঙ্গিতে সাবধান করিয়া দিলেন, মালতী রমেন্দ্রের কথা দুই চারি দিন আর কহে না। সতীর কেবল মাত্র ইঙ্গিতেই আজ মালতী ভীতা সঙ্কুচিতা ও লজ্জাবনতা। মালতী সাহস হারাইয়াছে—প্রগলভতা হারাইয়াছে। আজ কয়দিন সে আর হিন্দোলাব নিকট অগ্রসর হইতে সাহস করেনা। রাজ্ঞীর নিকট যাইবার আবশ্যক হইলে অন্য পরিচারিকার দ্বারা সে কার্য্য সারিয়া লইতেছে। কিন্তু হিন্দোলাব প্রশস্ত হৃদয়ে মালতীর নীচ কথা স্থান পায় নাই, তীব্র শোকাবেগে তাহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, ঠিকানা নাই—চিহ্ন নাই। সুপ্রশস্ত নির্ম্মল দর্পণে কত পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, কিন্তু তাহাতে পদার্থের ছবি দর্পণে অঙ্কিত হয় না, এবং দর্পণ ও পঙ্কিল হয় না। মালতীর কথায় হিন্দোলার পবিত্রহৃদয়ে মলিনত্বের ছায়াপাত ও হইল না। সতীরমণী মনে ও পরপুরুষের কথা ভাবেন না বাক্যে ও তাহাদের কথা কহেন না, শ্রুতিযুগল ও পর পুরুষের কথা শ্রবণ করে না; তাই হিন্দোলা মালতীকে ইঙ্গিতে রমেন্দ্রের সম্বন্ধে কথা কহিতে নিবারণ করিয়াছিলেন।

রমেন্দ্র মালতীকে আবার সাধ্য সাধনা করিলেন, আবার সানুনয় বিনয় করিলেন, আবার তাহার মন ভুলাইলেন। এবার মালতী হিন্দোলাকে প্রলুব্ধ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইল। আজ মালতী হিন্দোলাকে শেষ কথা কহিতে চলিল। রমেন্দ্র বিষধর, মালতী কুসুমে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মালতী কুসুম, রমেন্দ্ররূপ ভুজঙ্গম বক্ষে আবরিত করিয়া, গরল ভরা হৃদয়ে মধুমাখা কথায়

হিন্দোলাকে ভুলাইতে মন্থর গমনে রমেন্দ্রের কার্য্যোদ্ধারে তৎপরা হইয়া হিন্দোলার উদ্দেশে গমন করিলেন।

ইন্দুভূষণের সম্বাদ লইয়া হলধর প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেনা দেখিয়া, হিন্দোলা নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। এবার হিন্দোলা ইন্দুভূষণের প্রাণের আশঙ্কাই অধিক করিতে লাগিলেন। হিন্দোলা ভাবিলেন বোধ হয় ইন্দুভূষণ জীবিত নাই। জীবিত থাকিলে হলধর তাঁহার সন্ধান পাইয়া এতদিনে ফিরিত। দুই মাস উত্তীর্ণ-প্রায় এখন ও কোন সংবাদ নাই। এখনও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। হিন্দোলা একান্তে উপবিষ্টা—অশ্রুজলে হৃদয় প্লাবিত—কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাণেব আবেগে কহিলেন "প্রাণ নিতান্ত অস্থির হইয়াছে! ইন্দুভূষণের প্রথম অদর্শনে চারিদিকে ইন্দুভূষণময় দেখিতাম, কিন্তু নয়ন মুদিলে তাঁহার আকার ভাবিয়া লইয়া হৃদয়ে ধারণা করিতে হইত, এখন আব সে ভাব নাই এক্ষণে নয়ন মুদিলে সহসা তাঁর সত্ত্বা হৃদয়াসনে বিরাজিত দেখি—এক্ষণে যেন একেবারে হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, যেন হৃদয়ে অন্যমূর্ত্তির আর স্থান নাই। অভিষ্টদেবীর মূর্ত্তি হৃদয়াসন হইতে অপসারিত হইয়া কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। নয়ন মুদিলেই সেই জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ হৃদয়াসনে মুর্ত্তিমান দেখি। কিন্তু কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। যেন হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব যোগী মুর্ত্তি সমাধি মগ্ন রহিয়াছেন দেখিতে পাই—যেন অভীষ্ট দেবী সেই নবীন যোগীকে ক্রোড়ে করিয়া হৃদয়াসনে বসিয়া আছেন। যখনই নয়ন মুদি, তখনই হৃদয় শান্তিময় দেখি, মন ভুলিয়া যায়, প্রাণ আর বাহিরের জিনিষ দেখিতে চায় না, ইচ্ছা করে যেন সেই অপূর্ব্বমূর্ত্তি প্রাণ ভরিয়া দিবস রজনী দর্শন করি—প্রাণ যেন চায়, হৃদয় হইয়া হৃদয় রাজ্যেই প্রতিনিয়ত বাস করি, দেহ যেন ভারবহ বোধ হয়, মনে হয় যেন এ দেহ ত্যাগ করি। আবার বালকেরা ক্রন্দনের রোল তুলিয়া দেয় আবার পরিচারিকাগণ এ দ্রব্য নাই, সে দ্রব্য নাই বলিয়া বিরক্ত করে, অমনি আমি সেই হৃদয় রাজ্য হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হই। আবার যে সংসারের যাতনা সেই সংসারের যাতনা মধ্যে আসিয়া পড়ি, চারিদিকে তখন কেবল

অশান্তি বিরাজিত দেখি—আবার ইন্দুভূষণের বাহ্যিক ছবি মনে আসে, আবার তাঁহার বাহ্যিক ক্রিয়ার কথা মনে আসে, আবার তাঁহার ভালবাসার কথা মনে আসে—আবার তাঁহার বিলাসিতার কথা মনে আসে, তাঁহার দয়া, মায়া, স্নেহ, দান, ধর্ম্ম, সমস্ত যুগপৎ মনে উদিত হয়—আবার তাহার অদর্শনে প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে—অধীর হইয়া উঠে—আবার তাঁহার জীবনের আশঙ্কায় ভীত হই, অশ্রু বিসর্জ্জন করি, আবার শিশুগুলিকে বক্ষে করিয়া সে শোক আপাততঃ বিস্মৃত হই। তাঁহাকে হৃদয় রাজ্যে দেখিলে যেন মনে হয় তাঁরই আশ্রয়ে এই, বৃহদট্টালিকায় বাস করিতেছি, যেন তাঁর সত্বা চারিদিকে বিরাজিত, যেন আমি একাকী নহি, তাই একাকী থাকিয়াও আমি ভীত নহি, অপূর্ণ থাকিয়াও আমি যেন আমাকে পূর্ণ মনে করি"।

যখন হিন্দোলা শোকাবেগে উন্মাদিনীর ন্যায় আপন মনে আপনি কথা কহিতেছিলেন তখন মালতী হিন্দোলার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। অনন্য মনে হিন্দোলা মালতীকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখে নাই। মালতী ও হিন্দোলার হৃদয় ভাব, গোপনে অবগত হইবার জন্য সাবধানের সহিত গৃহে প্রবেশ করিয়া হিন্দোলার অলক্ষ্যে, অতি সাবধানে, কক্ষ বাতায়নপার্শ্বে গোপনে উপবিষ্ট হইয়া হিন্দোলার মনের কথা—প্রাণের কথা—সকলই শুনিলেন। মালতী যে ভাবে উপবিষ্ট ছিলেন সেই ভাবেই রহিলেন, যেন মালতীর শক্তি অপহৃত হইয়াছে— যেন শরীরে বল নাই, উঠিবার ক্ষমতা নাই। মালতী ভাবিলেন—কি করিতে আসিয়াছিলাম কি ঘটিল। আমি কোথায় রমেনের প্রেম পারাবারে ঝাঁপ দিবার জন্য হিন্দোলাকে ভুলাইতে আসিয়াছি। না আপনি আপন ভুলিয়া যাইলাম। হিন্দোলা সতীত্বের জ্বলন্ত বহ্নি, পবিত্র প্রেমের অপার পারাবার। "রমেন্ পতঙ্গ আর অগ্রসর হইও না, পুড়িয়া মরিবে! চিহ্ন থাকিবে না! হিন্দোলার প্রেম পারাবারে সাঁতার দিতে আসিও না? বিকলাঙ্গ হইয়া ডুবিয়া মরিবে। সে পারাবারের যোগ্য কেবল ইন্দুভূষণ, তুমি নহে। সাবধান রমেন! স্বপ্নেও হিন্দোলার কথা মনে আনিও না! কুচক্ষে তাহার দিকে আর চাহিবার কল্পনা ও করিও না"। সহসা হিন্দোলার

সজল দৃষ্টি মালতির দিকে পতিত হইল। মালতীকে দেখিয়াই কহিলেন "মালতী কতক্ষণ এখানে আসিয়াছ?"

মালতী সহসা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না, মালতী তাঁহার মনের কথা শুনিয়াছে কি না, জানিবার জন্যই হিন্দোলা মালতীকে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, মালতী তাহা বুঝিয়াছিল, তাই সে সহসা প্রশ্নের উত্তর দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিল। বলিয়াছি মালতী চতুরা, মালতী প্রগল্‌ভা। প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব চতুরা রমনীগণের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। পলকমাত্রেই মালতী প্রশ্নের কারণ অনুসন্ধান করিয়া উত্তর দিল "এই আসিয়াই বসিতেছি, কেন, আপনি কি আমাকে আসিতে দেখিতে পাননাই।"

হিন্দোলা—"পাইয়া থাকিব।"

সেই সময় হিন্দোলার ছোট মেয়েটী দৌড়াইয়া আসিয়া হিন্দোলার ক্রোড়ে বসিয়া মাতার মুখ চুম্বন করিলেন, এবং আধ আধ স্বরে বলিল "মা! তুই কাঁড্‌ছিস্ মা আমি আড় ডা-ডা খেয়া! বা! বা! নে! ই! জ্যা! নে! ই! চয়ে! কাঁডিস্‌নি জুজু ধয়ে! টুই কাঁড্‌বি, টবে আমি কাঁডিণ্‌ আমি ম্যানা খাই! ডাডাকে র্ডিস্‌নি"! সেই আধ আধ মধুমাখা কথায় হিন্দোলার কন্যা সকলই কহিল, সে মধুর কথায় হিন্দোলার হৃদয় গলিয়া গেল, প্রাণ মাতুয়ারা হইল। শিশুর মুখে মুখ দিয়া হিন্দোলা একবার নীরবে কাঁদিয়া রহিল।

সে হৃদয়ের ক্রন্দন—প্রাণের ক্রন্দন-বিরহ বিধুরা হিন্দোলাই বুঝিল, মালতী তাহা জানিতে পারিল না। হিন্দোলার কন্যা একবার স্তন পান করিয়া খেলা করিতে ছুটীল। বালক ছুটাছুটী ভাল বাসে, তাই ছুটীল। আবার রমেন্দ্রের সুন্দর ছবি মালতীর হৃদয়ে উপজিত হইল— আবার তাহার অনুনয় বিনয় মনে পড়িল—আবার মালতীর হৃদয়গতি ফিরিয়া যাইল—আবার সে হিন্দোলাকে প্রলুব্ধ করিতে যত্নবতী হইল। মালতী রমেন্দ্রের একখানি ছবি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন—সেই ছবিখানি বাহির করিয়া ছল করিয়া আপনাপনি দেখিতে লাগিল, হিন্দোলা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যালা, মালতী! তোর হাতে ওটা কিলা?" মালতী কথা

পাড়িবার অবসর পাইল, সে কহিল "না এ কিছু নহে।"

হিন্দোলা। "ঐ যে তোর হাতে কি রয়েছে? রাজাবাবুর পত্র এসেছে নাকি? বোধ করি কোন অমঙ্গল সম্বাদ হবে, না হলে এতক্ষণ দি'চ্ছনা কেন?"

মালতী। "না! রাজাবাবুর পত্র নয়। রাজাবাবু রাজাবাবু করে যে অস্থির হলে! ও কথা একটু ভুলে যাও! যখন বাঁচতে হবে কেন প্রাণটাকে দগ্ধাও?"

হিন্দোলা। "তবে কি হলধরের কাছথেকে পত্র এসেছে? বোধ করি কোন অমঙ্গল সম্বাদ হবে? না হলে প্রথমে কেন আমাকে পত্র দিলেনা? কেন আমাকে বঞ্চনা কর?"

মালতী। "তুমি আমার মনিব, অন্নদাতা! তোমাকে বঞ্চনা কি সম্ভবে?"

হিন্দোলা। "তবে তোমার হাতে কি, দেখি?"

মালতী। "এ তোমার দেখিবার জিনিষ নয়? যার জিনিষ তার কাছেই থাকুক।"

হিন্দোলা। "মালতি! আবার চাতুরী, আবার প্রবঞ্চনা"?

মালতী। "আবার সেই কথা! যাকে দেখতে পারনা তার চলন বেঁকা। তার চেহারা দেখে তোমার কি হবে? তুমি দিবানিশি যা ভাবছো বসে বসে তাই ভাবো"।

হিন্দোলা। "কার চেহারা মালতি! একবার দেখলে কি মহাভারত অসুদ্ধ হয়।"

মালতী। "মহাভারত অসুদ্ধ হয় না, পর্ব্ব বেড়ে যায়"।

হিন্দোলা। "তুমি দ্বিতীয় ব্যাস জন্মে উনিশপর্ব্ব রচনা করবে নাকি"?

মালতী। "দেখা যাক্ এখন তোমার অদৃষ্ট, আমার হাত যশ"।

হিন্দোলা! "মালতি! যে পর্ব্বে ঈশ্বর আমাকে ফেলেছেন, তা থেকে উদ্ধার হতে পাল্লে বাঁচি, আর নূতন পর্ব্ব শুনতে ইচ্ছা করে না। পূর্ব্ব জন্মে কতই পাপ করেছি এজন্মে তার বিশেষ ভোগ হোল! কত পতিপ্রাণা সতী রমনীর

গৌরবধন স্বামী সুখে বঞ্চিত করেছি, তাই এজন্মে সকল থাকিয়াও ঈশ্বর সমস্ত সুখে আমাকে বঞ্চিত করিলেন! আর ও অদৃষ্টে কত আছে জানিনা"।

মালতী। "অদৃষ্টে যা আছে চেষ্টা দ্বারা তা কিরূপে খণ্ডণ করবে? তার জন্য ভাবনা করা ও বৃথা! যা হবার তা হবে, কিছুতেই তা নিবারণ হবে না। তাই বলি মিছে ভেবে কি ফল"।

হিন্দোলা। "মন তো প্রবোধ মানেনা, ভাবনা আপনিই আসে"।

মালতী। "যা আপনি আসে তা আপনিই যায়, তবে কেন ভাব"?

হিন্দোলা। "সকলই মিছে মালতি! কেবল কর্ম্মসূত্রেই ভোগ হয়, তাই এজন্মে ভাল কাজ করলে যদি আর জন্মে ভাল হয়"।

মালতী। "তোমায় তো বলেছি, যখন যার সময় আসে তখন সেটা হবেই! রাজাবাবুর ঐশ্বর্য্যের ও কমি ছিলনা। যখন সময় এল সকল সুখে জলাঞ্জলি-দিয়ে, ঘর বাড়ি ত্যাগকরে চলে গেলেন, তোমার দিকে ফিরে ও চাইলেন না। তবে তুমি তাঁর জন্য কেন মিছে ভাব"।

হিন্দোলা। "মালতি! যা বলেছো কিছুই মিথ্যা নয়, কিন্তু মন বোঝে কে"।

মালতী। "মনকে বোঝাতে হয় তবে বোঝে, মন আপনার না পরের"।

হিন্দোলা। "মন আবার আপনার কৈ? মনতো পরের"।

মালতী। "মন পরের বটে, যখন যার কাছে থাকে তখন তারই মন"।

হিন্দোলা। "ঠিক কথা মালতি"।

মালতী। "মালতী কি কখন গরঠিক কথা বলে"।

হিন্দোলা। "তবে কেন তোর হাতে কি তা বলছিস্না"?

মালতী। "কেমন দেবতাটী দেখ দেখি"।

হিন্দোলা। "কৈ দেখি"!

মালতীর হস্ত হইতে হিন্দোলা ছবি-খানি ছিনাইয়া লইল। মালতী হিন্দোলাকে ছবি-খানি দিতেই আসিয়াছে, তবে কেবল পাঁচ কথায় নরম করিবার জন্য, এতক্ষণ দেয় নাই। এখন মালতী হিন্দোলাকে মুগ্ধ করিতে পারিয়াছে, হিন্দোলার মন ও কথঞ্চিৎ ফিরাইতে পারিয়াছে, তাই অবাধে মালতী হিন্দো-

লাকে ছবি-খানি প্রত্যার্পণ করিল। হিন্দোলা ছবি খানি দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন যে সেখানি রমেন্দ্রের ছবি। ছবি-খানি হিন্দোলা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। পূর্ব্বে হিন্দোলা কখন অপর পুরুষের মুখ দেখে নাই, পর পুরুষের সম্বন্ধে কথা কহিতনা, কিন্তু আজ যেন অন্যমনস্ক হইয়াই ছবিখানি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিল। সেই সুযোগে মালতী কহিল "দেখ দেখি! কি সুন্দর মুখখানি! কি টানা চক্ষু! কি সুন্দর ভ্রূ! কি কোমল চাহনি! মরি মরি! যেন চখে চখে কামের শরাসন প্রদীপ্ত"।

হিন্দোলা এতক্ষণে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, এবার বুঝিলেন মালতী তাহাকে পর পুরুষের ছবিখানি দেখাইয়া ভুলাইতে আসিয়াছে তাহাকে অসহায়া দেখিয়া মালতী সময় পাইয়াছে। তাই সে সাহস করিয়া রমেন্দ্রের— তাহার ভৃত্যের ছবিখানি তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসিনী হইয়াছে। হিন্দোলা ক্ষণকাল মস্তকাবনত করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন, নীরবে ইন্দুভূষণ অতুলনায় রূপরাশি ভাবিতে লাগিলেন। সুস্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণের নিকট খদ্যোৎ জ্যোতি; কোকিলের কলকণ্ঠ নিকটে কাকের কর্কশ স্বর—অপার অনন্ত অর্ণবের নিকট ক্ষুদ্র জলাশয়! হরি হরি! হিন্দোলা নীরবে হৃদয়মধ্যে নীরব হাসি হাসিলেন, সে হাসি মালতী দেখিল না, মালতী হিন্দোলার হৃদয় ভাব ও বুঝিল না। তাই মালতী আপনার সাহসে আপনি ভর করিয়া কহিল "তুমি কি এই মুখখানি ভাল বাস! কিন্তু সে তোমার জন্য পাগল, সে তোমার জন্য ভিখারি হইতে ও প্রস্তুত।" হিন্দোলা আজ কি কথা শুনিলেন! যেন সহস্র বজ্রধ্বনিতে সেই কথা গুলি তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইল! হিন্দোলা আপন হারা হইলেন! প্রকৃতিগত শান্ত ভাব হারাইলেন। হিন্দোলা চিৎকার করিয়া উঠিলেন। সে বিকট চিৎকার হিন্দোলার কলকণ্ঠ হইতে আর কখনই বিনিঃসৃত হয় নাই। হিন্দোলার কক্ষ দাস-দাসীতে পূরিয়া গেল। সকলেই অবাক, সকলেই স্তম্ভিত, সকলেই ভীত, চকিত ও ব্যস্ত, সকলেই কহিতেছে "কি হইয়াছে, কি হইয়াছে!" হিন্দোলার সেই বিকট স্বর থামিয়াছে হিন্দোলা দণ্ডায়মানা! স্থানবৎ দণ্ডায় মানা আহত অজগরের ন্যায় উন্নত মস্তকে

তীব্র দৃষ্টিতে মালতীর দিকে লক্ষ্য করিয়া দণ্ডায়মানা! দারুণ ক্রোধে প্রদীপ্ত তীব্র কটাক্ষ মালতীর প্রতি এখন ও স্থাপিত। হিন্দোলা বাহ্য জ্ঞান হারাইয়াছে—মুখে কথা নাই—স্থির ও নিস্পন্দ। মালতী ভয়ে ভীতা, কম্পিতা ও বিহ্বলা, তবে চতুর' চাতুরী হারায় না। সে দেখিল ঘোর বিপদ উপস্থিত, এই সময়ই সরিয়া পড়া উচিৎ; নচেৎ ভারি বিপদ। মালতী যেন সকলের চক্ষে ধুলি দিয়াই সরিয়া পড়িল। কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। পরিচারিকাগণ হিন্দোলাকে শয়ন করাইয়া দিল। কেহ ব্যজন করিতে লাগিল, কেহ মুখে শীতল জলসেক করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে হিন্দোলার চৈতন্য হইল। হিন্দোলা চৈতন্য লাভ করিয়াই ক্ষিপ্তার ন্যায় কহিল. "কে আছে মালতীকে এখনই বাটী হইতে বহির্গত করিয়া দাও। রমেন্দ্রকে রাজপ্রাসাদে অবরুদ্ধ করিয়া রাখ?" হিন্দোলার আদেশ, ক্রমে অন্দর হইতে সদরে পৌছিল. চতুর্দ্দিকে মালতীর অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু মালতী কোথায়? সে প্রাণভয়ে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। কোথাও তাহার অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। আদেশ মাত্র রমেন্দ্রকে রাজ প্রাসাদস্থ কারাগারে অবরুদ্ধ করা হইল। কিন্তু এ দারুণ আদেশের কারণ কেহই অবগত হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মালতী রাজভবন হইতে তাড়িতা হইয়া রমেন্দ্রের অজ্ঞাতসারে সেই রাত্রেই মুর্শীদাবাদ ত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করে। রাজ কর্ম্মচারীগণ অভিসারিণীর দুষ্টাশয় জানিতে পারিলে পাছে বিপদ ঘটে, এই ভয়ে দ্রুতপদে

সেই রাত্রেই ভাগীরথী পার হইয়া রমেন্দ্রের স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করে। একাকিনী রমণী রজনী যোগে পথ ভ্রমনে পাছে বিপদ ঘটে, তজ্জন্য মালতী পুরুষবেশে পলায়ন করিয়াছিল। ছদ্মবেশে মালতীকে বড়ই সুন্দর দেখাইয়াছিল। মালতী পরিচারিকা হইলে ও সুন্দরী, পূর্ণযৌবনে রূপের-গরবে মালতী, প্রাবৃট কালীন মেঘসম ঢল ঢল করিতেছে, মালতী—কেশদাম লুকাইবার জন্য মস্তকে উষ্ণীশ বাঁধিয়াছে, সে উষ্ণীশে সেই নবীন যুবাকে বড়ই সুন্দর দেখাই—য়াছে। আর মালতীকে মালতী বলিয়া বোধ হয় না! মালতী এক্ষণে মাধব-নামধারী যুবক সাজিয়াছে। কার সাধ্য তাহাকে রমণী বলিয়া চিনিতে পারে। সুতরাং পথি-মধ্যে তাহাকে কেহ সন্দেহ করিল না। সে নির্ব্বিঘ্নে নিসন্দেহে ভাগীরথী পার হইল। অপর পারে পৌছিতে যামিনী শেষ হইয়া আসিল; নবাবের তোপখানা হইতে প্রভাত সূচক কামান দাগিল। সে সময় মুর্শিদাবাদ ও তৎ সন্নিহিতস্থানে ঘাঁটীতে ঘাঁটীতে পাহারা থাকিত। ছদ্মবেশধারিণী মালতী চাতুরীর সহিত সেই পাহারার ঘাঁটী কাটাইয়া, নির্ব্বিঘ্নে অপর পারে আসিল। যামিনী অবসানা প্রায়, পারঘাটা জনশূন্য, পথে সে সময় একটী ও পথিকের সমাগম নাই, ঘাটমাঝি পথিককে অসময়ে পাইয়া লাভের বিশেষ সুযোগ দেখিয়া, কতই আবদার আরম্ভ করিল। কখন কহে, "এখনও রাত্রি অধিক আছে, এ সময় পার করিলে ফৌজদার ধরাইয়া লইয়া হাজতে রাখিবে।" কখন কহিল "এ রাত্রে গঙ্গা পার করিতে গিয়া কি প্রাণ হারাইব!" ইত্যাদি বহুবিধ কথায় মালতীকে বিলম্ব করাইতে লাগিল। চতুরা মালতীর নিকট চতুরালি সহজ নহে। মালতী কোন বাঙ্‌নিস্পত্তি না করিয়া বস্ত্র মধ্য হইতে একটী সুবর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়াই ঘাটমাঝিকে অর্পণ করিল। ঘাটমাঝির জীর্ণ দেহে যেন নূতন শোণিত প্রবাহিত হইল, অমনি দ্রুত পদে গৃহাভিমুখে গমন করিয়া মাঝিনীকে তাহা প্রদান করিল। মাঝিনী সুবর্ণ মুদ্রা কখন দেখে নাই সে ত্রস্তে একটী হাঁড়ির মধ্যে তাহা লুকাইয়া রাখিল। মাঝি আনন্দে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তাহার সহকারী নাবিকগণকে সংগ্রহ করিয়া ঝটিতি মালতী সহ নৌকা ছাড়িয়া দিল। নাবিক আরোহীকে কহিল

"সত্যেন্ বাবু ঢেক্ ঢেক্ লোক্ দেখিছি! এমন শ্রীন যুক্ত চেহারার পুরুষ মানুষ কখনো দেখিনি, কেমন কচি কচি মুখখানি, তেমনি আমার নব্য বয়েস চেহারা দেখে আমার প্রাণটা যেন কেমন কেমন ল্যায বটে। তুমি বট পুরুষ মানুষ নয়কো?"

মালতী। "হাঁরে মাঝি আমি মেয়ে মানুষ বটে, তুই আমায় তোর ঘরের মেয়েমানুষ করে রাখবি? বেন্তো এক এক মুটো খেতে দিলেই হবে" ইত্যাদি কথা বার্ত্তা চলিতেছে এবং নাবিক ও দ্রুত-গতিতে নৌকা চালাইতেছে।

প্রভাত বাযুত্থিত ক্ষুদ্র বীচিমালা-পরিপ্লুত জাহ্নবীবক্ষে নাচিতে নাচিতে মালতীকে নাচাইতে নাচাইতে তরী অপর পারোদ্দেশে চলিল—যেন প্রভাত বায়ুতে অঙ্গ ঢালিয়া জলসনে কেলি করিতে করিতে নৌকা তীরোদ্দেশে ছুটীতেছে; অল্প সময়ের মধ্যে নৌকা পরপারে আসিয়া লাগিল। মালতী বিলম্ব না করিয়া তীরে উঠিয়া গ্রামাভিমুখে গমন করিবার উদ্যোগ করিল। মালতী পরপারস্থ ঘাটে উত্তীর্ণ হইয়া আপনার পুরুষবেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। অতীব অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! সেই উষ্ণীশের পরিবর্ত্তে বেণী-বদ্ধকেশ বাহির হইয়া পড়িল। অঙ্গরাখা পরিত্যক্ত হইয়া উন্নত কুচ যুগল দৃশ্যমাণ হইল। পরিধেয় ধুতি, কোচা বিরহিত হইয়া অঙ্গ আবরিত করিল। মালতী আর যুবক নহে, এক্ষনে সুন্দরী যুবতী! হস্তে বৌপ্যের চুড়ি, নাসিকায় বসকলি, কপালে টীপ্ দেখাদিল। মালতী স্বীয় বস্ত্রালঙ্কারের গাঁটরিটী কক্ষে লইয়া রমেন্দ্রের বাটীর উদ্দেশে গমন করিল। পথি-মধ্যে পরিচিতা বহু নারীর সহিত তাহার দেখা হইল, তাহারা মালতীকে বহুদিন পরে দেখিয়া কত কথাই কহিতে লাগিল।

কেহ বলিল। "আহা আমাদের ভাগ্যর মেযে গো! বেঁচে থাক, তবু তার নাম আছে।"

কেহ বলিল। "মালতীকে যেন ভেঙ্গে চুরে পড়েছে, বড় মানুষের বাড়ী আছে কি না, ভাল মন্দ খাচ্চে, তাতে দুপয়সা জমছে, [illegible] সুখে আছে, তাই চেহারা ভাল হয়েছে, তাই যেন ভেঙ্গে চুরে গড়েছে"!

অপরা কহিল। "মালতী কুৎসিতা কবে? তবে এখানে অযত্নে ছিল তাই রূপটা ছাই ঢাকা ছিল, এখন মনের সুখ হয়েছে, যে রূপ সেই রূপই বেরিয়ে পড়েছে।" স্ত্রীলোকের কথা ফুরায় না, যেন কতকি কাযের কথা, যেন কত গোপনীয় কথা। তাই মালতীর সহিত তাহার পরিচিতা স্ত্রীলোকদিগের কথা শীঘ্র ফুরাইল না, সুতরাং অন্যদিন অপেক্ষা স্নান করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে তাহাদের বিলম্ব হইল, ইত্যবসরে মালতীর এক শৈশব সহচরী আসিয়া সেই খানে জুটিল, তাহাকে দেখিয়া মালতী কহিল, "কি গো! সদু যে, ভাগ্যি বেঁচে আছি, তাই দেখা হলো! সদু! তোর হাত সুধু কেনলো! এরকম কত দিনহলি!

সদু। "আর বোন! দেখা হলো তাই জিজ্ঞাসা কল্লে, ছেলে বেলাটার কথা কি মনে নাই। এক সঙ্গে বসা, এক সঙ্গে বেড়ান, এক সঙ্গে খেলা করা, ভাবনা ছিলনা, চিন্তা ছিলনা, দুঃখ ছিলনা! এখন সে দিন গিয়েছে।"

মালতী। "সই! পেটের জন্যে এ দেশ সে দেশ করে বেড়াচ্চি, মনে কি সুখ আছে, যে সইকে নিয়ে পুতুল খেলা কর্‌বো।"

সদু। "এতদিনের পর যখন দেখা হয়েছে, তখন সই তোমাকে ছাড়বো না, আজ আমার কুঁড়েতে হাতী পুর্‌বো।

মালতী। "আমি কি তোমার পক্ষে হাতী নাকি? তবু ও ভাল হাতীর নাতিনী খেও।"

ইত্যাদি কথোপকথনে পথি মধ্যে অনেক বেলা হইয়া গেল, শেষে মালতী তাহার সহচরীর সহিত তাহার বাটীতে গমন করিল। মালতী দিবসে সহচরীর বাটীতে আহারাদি সমাপনান্তে অপরাহ্নে দুই জনে রমেন্দ্রের বাটীতে গমন করিল, সেখানে রমেন্দ্রের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইলনা। আজ কয় দিবস হইল রমেন্দ্রের স্ত্রী তাহার পিত্রালয়ে গমন করিয়াছে। রমেন্দ্রের মাতা একা বাটীতে আছেন, রমেন্দ্রের পুত্রকন্যাগণ তাহার মাতার নিকট রহিয়াছে, কেবল মাত্র শিশুসন্তানটী তাহার মাতার সহিত গিয়াছে। মালতী দেশে আসিয়া শুনিল রমেন্দ্রের স্ত্রী বাটীতে আসিয়া শাশুড়ীকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়াছে, এবং নিয়মিত সেবা সুশ্রূষা করিতেছে তাহার আর পূর্ব্বের মতন ভাব নাই,

সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাই অধিক ব্যগ্রতার সহিত মালতী রমেন্দ্রের নূতন সংসার দেখিতে আসিল। রমেন্দ্রের মাতা মালতীকে দেখিয়া কহিল "কি গো! কখন এলে? এমন হঠাৎ যে?"

মালতী স্বীয় অবস্থা গোপন করিয়া কহিল "আমার নিজের একটু দরকার ছিল তাই এসেছি।"

রমেন্দ্রের মাতা। "আমার রমেন্ ভাল আছে তো? রাজাবাবুর কোন সন্ধান পাওয়া গেছে কি? রাণী মা একটু শান্ত হয়েছেন?"

মালতী, রমেন্দ্রের কথা কি বলিবেন ভাবিয়া আকুল সকল দিক বজায় রাখিবার মানসে উত্তর করিলেন, "ভাল আছেন, রাজাবাবুর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই, বৌরাণী এখন শোক ভুলে গিয়েছেন, বিষয় কর্ম্ম নিজে চালাচ্চেন। বাবা! সে কি বৌ! সে বউ বাবা, আপনি কাছারি কর্‌ছে পুরুষদের সঙ্গে কথা কচ্ছে, সাহেবদের চিঠি লিখ্‌ছে, ভাবনাও নাই, চিন্তেও নাই! লোক জনকে দেখলেই কেবল শোক দেখান হয়। চখে এক ফোঁটা জল ও নেই। ধন্যি কঠিণ প্রাণ!" মালতীর কথা রমেন্দ্রের মাতার ভাল লাগিল না, হিন্দোলা যে রূপ পতিব্রতা ও লজ্জাশীলা তাহাকে ওরূপ দোষারোপ, নিতান্ত অসম্ভব। রমেন্দ্রের মাতা মুখে কোন উত্তর দিলেন না, এবং মনে মনে মালতীর কথায় সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিলেন। মালতী রমেন্দ্রের বিপদের কথা তাহার মাতার নিকট প্রকাশ করিল না, পাছে তাহার অপমান ও রাজ বাটী হইতে তাড়িতা হইবার কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

মালতী রমেন্দ্রের মাতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া ও তাহাদের বাটী হইতে সত্বর বিদায় হইয়া সৌদামিনীর বাটীতে গমন করিলেন। মালতী, চপলা, চটুলা, চঞ্চলা, যৌবন বিহ্বলা ও রূপের গরবে গরবিনী। মালতী কুসুম, যৌবন বায়ুতে ইতস্ততঃ পরিচালিত, যেন যৌবন তরঙ্গে ঢলিয়া পড়িতেছে। যে নিকটে যাইবে তাহারই অঙ্গে ঢলিয়া পড়ে। সময় নাই, পাত্র নাই, অনবরত ঢলিয়া পড়িতেছে। সৌদামিনী স্থিরা, গম্ভীরা, যৌবন ভরে নমিতাঙ্গী, রূপসী হইয়া ও রূপের গরবে গরবিনী নহে, উন্মাদিনী

নহে। মনের মানুষ মিলিলে যৌবন দানে বিরতা নহে, কিন্তু লোকাপবাদে ভীতা, কুণ্ঠীতা। আহারাদি সমাপনান্তে মালতী ও সোদামিনী পর্ণ কুটীরে শয়ন করিল কিন্তু দারুণ গ্রীষ্মে অধিকক্ষণ শয়ন করা অসহ্য হইয়া উঠিল। কুটীর প্রাঙ্গণে সামান্য শয্যা রচনা করিয়া উভয়ে শয়ন করিল। পূর্ণীমা রজনী স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় কুটীর প্রাঙ্গণ হাসিতেছে—দূরে সরসী বারি পবনহিল্লোলে সঞ্চারিত হইয়া হাসিতেছে। পাপীয়া অম্রশাখে বসিয়া প্রাণের আবেগে ডাকিতেছে—প্রকৃতি দেবী জ্যোৎস্না মাখিয়া, ফুলাভরণে সাজিয়া রূপের গরবে গরবিনী হইয়া হাসিতেছে।

সৌদামিনী কহিল। "মালতী একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিবে"?

মালতী। "বলিব বৈকি! কবে কি তোমার কাছে গোপন করিয়াছি"?

সৌদামিনী। "তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি"।

মালতী। "কি কথা সহ"?

সৌদামিনী। "একটী কথা"।

মালতী। "বলিব, বলিব, বলিব"।

সৌদামিনী। "এতদিনের পর আজ হঠাৎ পূর্ণীমার শশীর উদয় যে"?

মালতী। "পূর্ণীমার শশী কি প্রত্যহ উদয় হয়? তিথির সংযোগ হওয়া চাই তবে উদয় হয়"।

সৌদামিনী। "পাখীটী কি শিকল কাটীয়াছে"?

মালতী। "বহুদিন"।

সৌদামিনী। "তবে এতদিন ছিল কোথা"?

মালতী। "পাখীটীকে আহার দেখাইয়া ভুলাইতেছিলাম।

সৌদামিণী। "তার পর"?

মালতী। "ভুলিয়াছিল"।

সৌদামিনী। "তার পর"?

মালতী। "ভুলিতে না ভুলিতে পাখীটী ব্যাধের হাতে ধরা পড়িল, সকল গোল মিটিয়া গেল, আমি ও পিঁজারা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়া পালাইলাম"।

মালতী এই কথা বলিয়া নীরব হইল, নীরবে শিহরিয়া উঠিল, সৌদামিনী তাহা দেখিলেন—মালতীর হৃদয়ের প্রকৃত কথা বুঝিলনা। মালতী চতুরা সে কথা চাপা দিবার জন্য অন্য কথা পাড়িয়া কহিল "তোমার সাধের পাখিটীর দেখানাই যে সহু! এমন সুখের যামিনী অমনি কাটিবে?"

সৌদামিনী। "আর বোন! পিঁজারা খালি যায় না বটে, কিন্তু মনের মতন পাখী মেলে কৈ? নিত্য নুতন পাখী আসিয়া পিঁজারা দখল করিয়া বসিতেছে, আবার চলিয়া যাইতেছে। আবার নূতন আসিয়া জুটীতেছে।"

মালতী। "এ ব্যবসা মন্দ নহে, আধার যোগানই সার।"

সৌদামিনী। "আধারে খুসি হয়ে মন বসিয়ে থাকেতো ভাল, কিন্তু তাই বা থাকে কৈ?"

মালতী। "আজ পিঁজারা খালি যাবে নাকি?"

সৌদামিনী। "তোর জ্বালায় গেলুম বোন! আর হাড় জ্বালাসনি, তোর মতন মনের মত পাখী কোথায় পাই বল"?

মালতী। "বিলাসিনী বাড়িতে এলে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল"?

সৌদামিনী। "হয়ে ছিল"।

মালতী। "ভাব গতিক কি"?

সৌদামিনী। "অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন"।

মালতী। "সে কি রূপ"।

সৌদামিনী। "এখন বিলাসিনীর সম্পূর্ণ ভাবান্তর দেখ্‌ছি"।

মালতী। "পূর্ণমাত্রায় নাকি"?

সৌদামিনী। "শাশুড়ীকে গুরুর ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করা; দেবর, ননদকে যত্ন করা, দেবতা ব্রাহ্মণকে ভক্তিকরা, অতিথি অভ্যাগতকে সেবা করা, দিবারাত্র দেবপূজায় মনোযোগ, বিলাসিনী এখন এই সমস্ত নিয়েই আছে, এখন আর বিলাসিনী সে বিলাসিনী নাই"।

মালতী। "বটে! এমন কত দিন"?

সৌদামিনী। "স্বামীর কাছ থেকে এসে অবধি"

মালতী। "বিলাসিনী বাপের বাড়ী থেকে কবে ফিরে আস্‌বে বলতে পারো?"
সৌদামিনী। "শুনেছি শীঘ্র নয়।"

মালতী ভাবিল, আমাকে কল্য প্রাতেই বিলাসিনীর পিত্রালয়ে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে, সাক্ষাৎ না করিতে পারিলে বৈরসাধনের উপায় স্থির হইবে না। আবার মনে মনে কহিল, "হিন্দোলা! তোমার সোনার রাজ্য ছারখার করিব, তোমার পবিত্র চরিত্র কলঙ্কিত করিব।" মালতীর প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, কি উপায়ে বৈরনির্যাতন সাধিত হইবে, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। মালতী সহুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের দেশে, যে পাগলাটা রাত্রে শ্মশান যাগাতো, আর দিনের বেলায় পাগলামী করে মদখেয়ে বেড়াত সে এখন কোথায়?"
সৌদামিনী। "আজ কদিন তাকে দেখিনি, মাঝে মাঝে কোথায় যায়, আবার কোথা থেকে এসে উপস্থিত হয়।"
মালতী। "কাল তার সন্ধানটী রাখিও, আমি সকাল বেলাই বিলাসিনীর পিত্রালয় যাইব, হয় তো কালই ফিরিয়া আসিব, তাহাকে রাখিতে যাহা খরচ হয় করিও।" এই বলিয়া মালতী সৌদামিনীকে কিছু অর্থ দিয়া চলিয়া গেলেন।

মালতী চলিয়া গেলে সৌদামিনী কতই ভাবিল। কেন মালতী তাহাকে তান্ত্রিক ভৈরবের কথা জিজ্ঞাসা করিল? কেন তাহাকে হাতে রাখিতে কহিল? মালতী নিশ্চয় কিছু গুণ জ্ঞান করিবে, সে বড় লোকের বাড়ী থাকে, বড় লোকের মেয়েরা কেবল গুণ জ্ঞান নিয়েই আছে তাই বুঝি দরকার হয়েছে? সেই সন্ধানেই মালতী এয়েছে, এ না হয়ে যায় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া মালতী, সৌদামিনীর অজ্ঞাতসারে রাজনগরাভিমুখে প্রস্থান করিল। রাজনগরে বিলাসিনীর পিত্রালয়, বিলাসিনী আজ কয় দিন পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন। যে সময়ের কথা হইতেছে সে সময় রাজনগর বীরভূমীর মধ্যে একটী সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল। বহু বিদেশী বণিক এই স্থানে রেশমের কুঠি সংস্থাপন করিয়া বহুঅর্থ উপার্জ্জন করিত। হ্যাম্‌টন বলিয়া জনৈক ইংরেজের এই নগরে একটী কুঠীছিল, বিলাসিনীর পিতা সেই কুঠীর দেওয়ান ছিলেন, সুতরাং বালিকাবস্থায় পিতার সহিত বিলাসিনী হ্যাম্‌টন সাহেবের কুঠীতে গমন করিত। বিলাসিনীর সমবয়স্ক হ্যাম্‌টন সাহেবের একটী পুত্র ছিল, তাহার নাম জন। জন বিলাসিনীকে বড় ভাল বাসিত, উভয়ে একত্রে প্রায় লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বিলাসিনী অধিক সময় জনেদের বাটীতে থাকিতেন, সুতরাং বিলাসিনীর আচার ব্যবহার অনেকটা বিলাতী ধরণে হইয়াছিল। তাই বিলাসিনী কুলবধুর ন্যায় লজ্জাশীলতা শিক্ষা করিতে পারে নাই—তাই বিলাসিনী শীঘ্র গৃহকার্য্যে মন দিতে পারে নাই—তাই বিলাসিনী হিন্দুকুলবধুর ন্যায় ততটা অবরোধ-বাসিনী হইতে পারে নাই—তাই মাটীর ঢিপি দেখিয়া গড় করিত না—সন্ধ্যাকালে শাঁখ বাজাইতনা—গৃহের পৈতৃক শালগ্রামের সেবা করিত না—তুলসীগাছ দেখিলেই চরণতলে দলিত করিত। গরবিনী পিতৃসোহাগিনী বিলাসিনী বাস্তবিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষিতা না হইয়াও বাল্য সহবাস বলে পাশ্চাত্য রুচি তাহার অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া বালিকা হইতে তাহাকে এক প্রকার বিবি করিয়া তুলিয়াছিল। তাই বিলাসিনী বাল্যকালে পুতুল খেলিতে শিখেনাই—শাঁজুতির ব্রত করিয়া সতিনের মাথা খাইতে শিখে নাই।

বাল্যকাল হইতে একত্র সহবাসে, একত্র খেলাধুলায়, জন ও বিলাসিনীর মধ্যে ভালবাসা জন্মিয়াছিল—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভালবাসা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে নব-প্রেমানুরাগে পরিণত হইয়াছিল। পূর্ব্বে পল্লিগ্রামে হিন্দুয়ানী অতিশয় প্রবল ছিল, সাহেবের সহিত একত্র সহবাস পল্লিগ্রামবাসীর বড় ভাল লাগিত না। বিলাসিনী ক্রমে বয়স্থা হইয়া উঠিল, তাহার পিতা ও বিশেষ সঙ্গতিপন্নছিলেন, তথাপি বিলাসিনীর সহজে বিবাহ হইলনা। যে স্থান হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসে, কাণা ঘুসা শুনিয়াই সেই স্থানেই বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং বিলাসিনী পূর্ণ ষোড়শ বৎসর বয়স্কা হইয়া ও অনূঢ়া।

বিলাসিনী ইংরাজি কহিতে পারে—পিয়ানো বাজাইতে পারে—ইংরাজি ধরণে গান গাহিতে পারে—এবং বলে নাচিতে পারে। বিলাসিনী শাটীর পরিবর্ত্তে গাউন পরিতে ভালবাসে—শালগ্রাম পূজার পরিবর্ত্তে গির্জ্জায় গিয়া চক্ষুবুঝাইয়া যীশুর প্রেমগান গাহিতে প্রীতি বোধ করে।

বিলাসিনী চা খায়—জামা পরে—কখন কখন জুতা পায়ে দেয়—শাঁখের পরিবর্ত্তে বিউগুল বাজায়—লুকাচুরির বদলে লন্‌টেনিস খেলে। বিলাসিনীর পিতা ক্রমশ এসমস্ত প্রশয় দিয়া আসিতে ছিলেন, তাই আজ এত বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিয়াছিল।

যে স্থান হইতে বিলাসিনীর বিবাহের কথা আসে, বিলাসিনীর ব্যবহার সম্বন্ধে গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত হইলেই সেখানে বিবাহের কথা ভাঙ্গিয়া যায়। ক্রমে বিলাসিনী বয়স্থা হইয়া উঠিল—তথাপি বিবাহ হয় না। শেষে মুর্শিদাবাদ জেলায় অন্তর্গত খড়গ্রাম হইতে রমেন্দ্রের সহিত সম্বন্ধের কথা আসিল। লোক জনের অপেক্ষা না করিয়া রমেনের পিতা স্বয়ং পাত্রী দেখিয়া এক প্রকার বিবাহ স্থির করিয়া গেলেন, কেবল মাত্র পাত্র দেখা ও দিন স্থির বাকি রহিল, বিলাসিনীর পিতা পাত্র দর্শন কার্য্য ও সঙ্গে সঙ্গে সারিয়া দিলেন, একটা নগদ টাকা ধরিয়াদিলেন।

রমেন্দ্রের পিতা নিতান্ত নিস্ব ছিলেন, অর্থলোভে তিনি সহসা রাজি হইলেন—জাত্যাভিমান অগাধ জলে ভাসাইয়া দিয়া—আত্মীয় কুটুম্বের

মুখাপেক্ষা না করিয়া—অর্থলিপ্সু রমেন্দ্রের পিতা, ধীরে ধীরে সম্বন্ধ পাকাইয়া ফেলিলেন, শেষে বিবাহেরদিন স্থির করিয়া সহসা গোপনে একদিন বিলাসিনীর সহিত পুত্রের বিবাহ সমাধা করাইলেন। ক্রমে লোক জানাজানি হইল। রমেন্দ্রের পিতাকে সকলে একঘরে করিলেন। বিলাসিনীর পিতা বহু অর্থব্যয়ে সমাজ নিমন্ত্রণ করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মর্য্যাদা রাখিয়া রমেন্দ্রের পিতাকে চালাইয়া দিলেন। দুই বৎসর কাল বিবাহ হইয়া গেল, তথাপি নববধূ শ্বশুরালয়ে প্রেরিত হইলনা।

নবোঢ়া যুবতী শ্বশুরালয়ে আসিলে পাছে বয়স্থা বলিয়া কেহ নিন্দা করে, সেই জন্য বিলাসিনীর পিতা কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠান নাই। ইতিমধ্যে রমেন্দ্রের পিতার মৃত্যু হয়, সে সময় বিলাসিনীর পিতা রমেন্দ্রের কোন সংবাদ লইতেন না। কিছু দিন অতীত হইলে রমেন্দ্র স্বীয় উপার্জ্জনে গুছাইয়া উঠিলেন, বিলাসিনীর পিতার মৃত্যু হইল, বিলাসিনীর আদর কমিয়া আসিল, সাহেব-দিগের সহিত সাক্ষাৎ করা অবধি বন্ধ হইয়া গেল। বিলাসিনীর পিত্রালয়ে অবস্থান ক্রমে যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিল, শেষে বাধ্য হইয়া শ্বশুরালয়ে আগমন করিলেন। আর পিত্রালয়ে যাইলেন না। বহুদিন পরে এবার বিলাসিনী পিত্রালয় গিয়াছেন। এক্ষণে বিলাসিনীর স্বভাব চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটীয়াছে। এখন আর সে বিলাসিনী নাই—এখন বিলাসিনী—হিন্দু পরি-বারের অমূল্য রত্ন হিন্দুরমনী। এখন বিলাসিনী পূজাকরে—অতিথি সৎকার করে—স্বামী সেবা করে—গুরুজনকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে—ধর্ম্মচিকীর্ষু বিলাসিনী পূর্ব্বের কথা ভুলিয়াছেন—পূর্ব্ব আচার ব্যবহার ভুলিয়াছেন—স্বভাব চরিত্র পরিশোধিত করিয়াছেন। এ অপূর্ব্ব অভাবনীয় পরিবর্ত্তন কি স্বভাব সিদ্ধ? পরিবর্ত্তন মাত্রেই স্বভাব সিদ্ধ। চক্র পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু চক্র পরিবর্ত্তনের কারণ আছে? বিলাসিনীর স্বভাবের পরিবর্ত্তনের ও কারণ আছে। সকলই সময় স্বাপেক্ষ সত্য, কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যেরই নিয়ন্তা আছে। অম্রপক্ক হইলেই বৃন্তচ্যুত হইবে, অতএব অম্রের পক্কতা সময় সাপেক্ষ। কিন্তু সময়ে কালের ও নিয়ন্তা আছে। বিলাসিনীর পরিবর্ত্তন কাল আসিয়াছিল, তাই আপনাপনি

পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইল। কিন্তু কে সে পরিবর্ত্তনের কারণ? শুভক্ষণে হিন্দোলার সহিত বিলাসিনীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, শুভাদৃষ্টবলে বিলাসিনী পুণ্যশীলা হিন্দোলার সহচর্য্যা করিতে পাইয়াছিল, তাই আজ বিলাসিনীর স্বভাবে অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটীত হইল। উত্তপ্ত অগ্নির সংযোগে স্বর্ণের বিশুদ্ধিতা পরিসাধিত হয়। সামান্য কর্দ্দম কুম্ভকারচক্র নিহিত হইয়া গঠনে পরিণত হয়—সাধু সহবাসে কলুষিত চরিত্র ও পবিত্র হয়। হিন্দোলার সহিত অল্পদিনের সহবাসে বিলাসিনীর পাপস্বভাবের পরিবর্ত্তন সাধিত হইল—বিলাসিনী আর পাশ্চাত্য রুচিমার্জ্জিত বিলাতীমিশ নহে, এক্ষণে হিন্দুরকুললক্ষ্মী।

মুর্শিদাবাদ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিলাসিনী স্বদেশে অতি সুন্দর ভাবে রমেন্দ্রের গৃহলক্ষ্মী রূপে বিরাজ করিতেছেন। কতিপয় দিবস শ্বশুরালয়ে থাকিয়া, স্বামীর গৃহোজ্জ্বল করিয়া, বৃদ্ধা শ্বশ্রুর সেবা সুশ্রূষা করিয়া. দেবর ননদের উপর যত্ন দ্বারা সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া, এক্ষণে পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন। মালতী একাকিনী বিলাসিনীর পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে মালতীর মাথা ঘুরিয়া গেল, যে আশায় ভর করিয়া মালতী এতদূর আসিয়াছিল মালতীর সেই বৈরনির্যাতনোপায়স্বরূপিনীআশা সমূলে উন্মূলিত হইল। ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় মালতী বসিয়া পড়িল। মালতী বিলাসিনীর পিত্রালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যে কক্ষে বিলাসিনী ছিল, তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিল বিলাসিনী পূতগাঙ্গবারি-সম্পৃক্ত সচন্দন বিল্বপত্রীরাজিতজবাকুসুমদামে দেবজাপুনুরতা, কুঙ্কুমকর্পূরসর্জ্জরসদগ্ধবাসে কক্ষ সুবাসিত। সম্মুখে স্বহস্ত নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, মধ্যে মুদিত নেত্রা বিলাসিনী ধ্যানমগ্না।

মালতী কতক্ষণ বসিয়া রহিল, বিলাসিনীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। পুজা সাঙ্গ হইলে দেবী প্রণাম সময় মস্তকোত্তলন কালে মালতীরদিকে বিলাসিনীর দৃষ্টি পতিত হইলে বিলাসিনী মালতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি লো মালতী! হঠাৎ কোথা থেকে?"

মালতী। "শ্রীপাঠ বৃন্দাবন থেকে, কালাচাঁদের আদেশে, শ্রীরাধার অনুসন্ধানে, দেশ বিদেশ ঘুরে শেষে এই গুপ্তকুঞ্জে শ্রীমতীর দর্শন পেলেম।"

বিলাসিনী। "মালতী তুমি সাধ্বি! পবিত্র বৃন্দাবন থেকে এসেছো, তোমার দর্শন কল্লেও পুণ্য আছে।"

মালতী। "ভাল করে দেখিলে কৈ? কতক্ষণ ধরে তোমার ঘরে বসে আছি, তোমার নজরই তো পড়েনা।"

বিলাসিনী। "রাজাবাবুর সংবাদ কি? হলধর ফিরিয়াছে? রাণীমার মনের অবস্থা কিরূপ?"

মালতী। "রাজাবাবুর কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই। হলধর এপর্য্যন্ত ফেরে নাই। রাণীমার মনের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

বিলাসিনী। হিন্দোলার পরিবর্ত্তন! সাগরের জল শুষ্ক! হিমালয় সমভূমি! ইহা কি সম্ভব? হিন্দোলার গুণের তুলনা নাই; হিন্দোলা হিন্দুকুলবালার আদর্শ।"

মালতী। "শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর! বউরাণীকে চেনা, চারপাটী দাঁতের কর্ম্ম। বাবা! সে কি বউ! সে যে জাঁহাবাজ দরবারে মেয়ে!"

বিলাসিনী। "মালতী! আমার সম্মুখে হিন্দোলার নিন্দা ক'রোনা, আমার তা সইবেনা।"

মালতী। "তা সইবে কেন বল? আমারই সো'গ।"

বিলাসিনী। "যার নুন খাই তার গুণ গাই, তা দূরে গেল, তার আবার নিন্দা। একবার তোর নিজের অবস্থাটা ভাব্ দেখি রাণীমা আশ্রয় না দিলে এতদিনে তোর কি হ'ত বল দেখি? তোর যে হাড়িরহাল হ'ত?"

মালতী। "আমি তো নিন্দা করিতেছিনা, প্রকৃত কথাই প্রকাশ করিতেছি!" এই কথা বলিয়া আসল ঘটনাটী চাপিয়া গেলেন, সেকথা প্রকাশ করিলে সকল দিক নষ্ট হইবে ভাবিয়া, সে কথা চাপা দিয়া বিলাসিনীর মন ফিরাইবার জন্য বলিলেন, "সেই তোমার ছেলেবেলার ভালবাসার 'জন' ভাল আছে তো?"

বিলাসিনীর হৃদয় হিন্দোলার অযথা নিন্দায় মাতিয়া উঠিয়াছে। যাহার জন্য তাহার হৃদয় গতি ফিরিয়াছে, চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যাঁহাকে তাঁহার দেবী বলিয়া জ্ঞান ও ধারণা, তাঁহার নিন্দা বিলাসিনী সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন।

ঔষধ ধরিলনা দেখিয়া, মালতী এবার পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করিলেন, বলিলেন, " বউরাণীর নিন্দা করিতেছিনা, তবে কাল অমন রাজা স্বামী বিবাগী হইয়া গেল, আজ তাঁর আবার আহার নিদ্রা কি ? বিষয়াদির ব্যবস্থা করাই বা কি ? তাঁর আবার ছেলেদের উপর মমতা যত্ন কি ? সতী. স্বামীর জীবনান্তে তাঁর সহগমন করে, তার কি কোন বিষয় দেখা শুনা ভাল দেখায় ? না, দেখ্‌তে ইচ্ছা করে ? তাই বলিতেছিলাম, নিন্দা করি নাই। "

বিলাসিনী, মালতীর কথায় এবার কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন "সকলই সত্য, কিন্তু বউরাণী কি বলে সোনার রাজ্য ভাসাইয়া দিয়া হৃদয় পুত্তলি শিশু গুলিকে অকুল পাথারে ভাসাইয়া একদিকে চলিয়া যান ?"

মালতী। " স্বামী বিরহে, স্ত্রীর পক্ষে, অরণ্য ও রাজপুরী সমান "।

বিলাসিনী। " যখন দেখিবেন স্বামীর অনুসন্ধান হইল না, যখন বুঝিবেন রাজাবাবু ইহজীবন ত্যাগ করিয়াছেন, বউরাণী তখন তাহার ব্যবস্থা নিজেই করিবেন, কাহাকে ও শিখাইতে হইবেনা। "

মালতী। "পাকা মেয়ে, তাহাকে শিখায় এমন লোক তো দেখিনা, রাজবাটীর আমলা থেকে সামান্য দাসদাসী পর্য্যন্ত বউরাণীর ভয়েই জড়সড় "।

বিলাসিনী। '' সেটাকি মন্দ কথা মালতী ! ''

মালতী। " বড় মানুষদের কিছুই মন্দ নহে, কথায় বলে দেবতার বেলা লীলা খেলা, যত পাপ মানুষের বেলা। "

হিন্দুকুলবালা সহজে স্বামীর কথা অপরকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেনা, পাঁচ কথায় স্বামীর কথা উত্থাপন করে, বিলাসিনী তাই রাজবাটীর কথা তুলিয়া স্বামীর অনুসন্ধান লইতে প্রবৃত্ত হইল। অতি সাবধানে আস্তে আস্তে মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল; "মালতী ! রাজবাটীতে কার হাতে এখন বিষয় কর্ম্মতত্তাবধারণের ভার ?"

মালতী। "বাহিরে দেওয়ানজীর উপর ভার বটে, কিন্তু বউরাণীর হুকুমেই সব চল্‌ছে।

বিলাসিনী। "আর কেহ দেখেনা?"

মালতী বুঝিল বিলাসিনী এবার স্বামীর কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ না করিয়া, বিলাসিনীকে হিন্দোলার কিম্বা তাহার স্বামীর বিপক্ষে উত্তেজিত করাই মালতীর উদ্দেশ্য। মালতী কেন প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিবে? "সে কহিল, আমাদের বাবুই একরকম সর্ব্বময় কর্ত্তাই ছিলেন, তবে কি জান! মেয়ে মানুষের সংসার কি জানি? কি হতে কি হয়! পাঁচ লোকে পাঁচ রকম যদি রটায়, এই ভয়ে তিনি আর অন্দরেই যান না।"

বিলাসিনী। "তবে তাঁহার অন্দরে যাওয়া নিষেধ?"

বিলাসিনী স্বামীর কুস্বভাব বিশেষ অবগত ছিলেন, মনে মনে বুঝিলেন কিছু ব্যত্যয় ঘটীয়াছে, বিলাসিনী মালতীকে ও চিনিতেন, তাই আর অধিক কথা বলিলেন না, নীরব হইয়া রহিলেন।

বিলাসিনীকে নীরব দেখিয়া মালতী বুঝিল ঔষধ ধরিয়াছে, এবার রসান আরম্ভ করিল, মালতী কহিল "তুমি তো বউরাণী বউরাণী করিয়া পাগল হইতেছ, কিন্তু বউরাণী সহজ্ লোক নহেন।"

বিলাসিনী এবার উত্তর করিল "সে কি মালতী?"

মালতী। "সকল কথাই কি প্রকাশ করে বলতে হয়! বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ; তাই হয়েছে আমাদের মেয়ে রাজার রাজ্যে, তুমি যখন সেখানে ছিলে, আমাদের বাবুই তখন এক রকম কর্ত্তা ছিলেন। দেওয়ানজী কাণা হয়ে ছিল, কোন ভারই তাঁর উপর ছিলনা। এখন আবার দেওয়ানজী কর্ত্তা। তিনি যে কি মনে মনে ভাবেন তিনিই জানেন, আর ঈশ্বর জানেন, আমরা গরিব লোক কি বুঝ্‌বো বল! আমাদের দূর ব'ল্‌লে বিশহাত তফাত হই।"

বিলাসিনী। "তাই বুঝি তুমি বিশহাত তফাত হ'য়ে এখানে এসেছো?"

মালতী। "তা কেন আসিব! বাবুর উপর বউরাণীর ক্ষর নজরটা পড়েছে

দেখে সরে পড়েছি, কি জানি কি হতে কি হবে। এখন তোমার কাছে এসে, পড়েছি তোমার যা মনে আছে তাই কর।”

বিলাসিনী মালতীর কথা বুঝিলেন কিন্তু বিশ্বাস করিলেন না, ভাবিলেন ইহার ভিতর গুঢ় তত্ত্ব আছে—রহস্য আছে, প্রকৃত কথা মালতী কখনই প্রকাশ করিবে না, ফলে কথাটা আমায় লইতেই হইবে, বোধ করি কুস্বভাবের জন্য বউরাণী মালতীকে বাটী হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া দিয়াছেন, তাই মালতীর বউরাণীর উপর এত আক্রোশ।

বউরাণী মালতীকে কেন তাড়াইলেন? নিশ্চিৎ ইহার কারণ আছে। মালতী কুচরিত্রা, প্রগলভা, বাচাল, মালতীর কথায় কোন মতেই বিশ্বাস নাই।

মালতী বিলাসিনীকে ক্ষুভিতা দেখিয়া মন ফিরাইবার জন্য কহিল “চলনা বিলাস! একবার জনেদের বাড়ি বেড়াইয়া আসি, জন এখন বোধকরি একটা সাহেব হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ছোট বোন গুলির কি বিবাহ হইয়া গিয়াছে? আমার বড় সাধ একবার তাদের দেখে আসি।”

বিলাসিনী সেকথার উত্তর করিলেন না, নীরব রহিলেন দেখিয়া, চতুরা মালতী আর এক চাল চালিলেন “তোমাকে মুর্শীদাবাদে লইয়া যাইতে আসিয়াছি, বাবুর জোর হুকুম সত্বর যাইতে হইবে।” বিলাসিনী এবার উত্তর করিলেন, বলিলেন, “কর্ত্তা বাবু না আসিলে তিনি মুর্শীদাবাদ যাইবেন না, সুতরাং এই সংবাদ দিবার জন্য তোমাকে সত্বর রওনা হইতে হইবে।” মালতী দেখিল কোন ফলই ফলিলনা। সুতরাং আবার কি চাল চালিবে তাহার উপায়োদ্ভাবন করিতে লাগিল। সে বেলা সেখানে কাটাইয়া মালতী সৌদামিনীর বাটীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল। চতুরার চাতুরি বিফল হইল, বুঝিল বিলাসিনীর দ্বারা কোন ফলের আশা নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অদ্য বৈশাখী পূর্ণিমা। ললাটেশ্বরীর পুরি মধ্যে আজ মহোৎসব। প্রভাত হইতে দেবালয়ের ভৃত্যগণ দেবালয় সুসজ্জিত করিতেছে। তোরণের উভয় পার্শ্ব কদলিবৃক্ষ সমন্বিত চূতপল্লবাবৃত পূর্ণঘটে পরিশোভিত, উর্দ্ধদেশে নবপল্লবরচিত রচনামালা স্থাপিত। পুরির বহির্ভাগে সৌধোপরি শ্বেত, নীল, পীত, লাল, বিচিত্র বর্ণের পতাকা সমূহ বায়ুভরে পত পত বেগে উড্ডিয়মান। দেবালয়ের উন্নত চূড়ে উন্নত ধ্বজপতাকা অভ্রস্পর্শ করিয়া উড্ডিন হইতেছে, যেন বলিতেছে "আয় আয় হিন্দু সন্তান আনন্দময়ীর চরণ প্রান্তে লুটাইয়া জীবন মন সার্থক করিবি আয়!"

দেবালয়ের অভ্যন্তর ভাগ কুসুমমালা ও স্ফাটীক নির্ম্মিত লাণ্ঠানে সুসজ্জিত। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক এক করিয়া যাত্রীগণ ক্রমে দলে দলে আসিয়া ললাটেশ্বরীর বহিঃপ্রাঙ্গন ছাইয়া ফেলিল, লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। যাত্রীগণের মধ্যে স্ত্রীলোকের ভাগই অধিক। কেহ সরিদ্গঙ্গায় স্নান করিতেছে—বেদ ও মন্ত্রোচ্চারণ শব্দে সরিদ্গঙ্গা অনবরত প্রতিধ্বনীত হইতেছে—কেহ সন্ধ্যোপাসনা করিতেছে—কেহ গঙ্গার স্তবপাঠ করিতেছে—যেন কি পরমানন্দে যাত্রীগণ মাতিয়া উঠিয়াছে।

পুরির বহির্দেশে মেলা বসিয়া গিয়াছে, কোথাও মিঠাইয়ের দোকান, কোথাও খেলানার দোকান, কোথাও ফলের দোকান, কোথাও তরিতরকারি ও মৎস্যাদি বিক্রয় হইতেছে, কোথাও মুদির দোকান বসিয়া গিয়াছে, কোথাও মনিহারির দোকানে বিবিধ খেলানা বিক্রয় হইতেছে—বালকেরা দলে দলে

দোকানে ভিড় বাঁধাইয়া দিয়াছে, কোথাও পানের খিলির দোকান বসিয়াছে—যুবকদলে দোকান ঘেরিয়া বসিয়া আছে—কোন যুবক কোন একটী রসিকাকে পাইয়া গোপনে দুএক খিলি পানের সঙ্গে প্রেম বিলাইতেছে। কোন কোন যাত্রী আহারের উদ্যোগে ব্যস্ত, হোগলার আচ্ছাদনে ও দরমার সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর প্রস্তুত হইয়াছে, কুটীরাভ্যন্তরস্থ সমস্ত প্রকোষ্ঠই প্রায় যাত্রীদলে অধিকৃত। কোন প্রবীণা সিক্ত কেশদাম চূড়া ভাবে বেণিবদ্ধ করিয়া সম্মুখভাগে স্থাপিত করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে উনুনে ফুঁ দিয়া কাষ্ঠ প্রজ্জালিত করিতে বিশেষ ব্যস্ত—কোন যুবতী কোন প্রকোষ্ঠের মধ্যে বসিয়া তরকারি বনাইতেছে, কোন যুবতী মসলা পেসন করিতেছে ও প্রকোষ্ঠ বাতায়ন মধ্য দিয়া কোন রসিক যুবকের দুই একটী কটাক্ষবিক্ষেপলাভ করিতেছে। স্থানাভাবে কেহ কেহ বৃক্ষের শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে। কোথাও বাজী হইতেছে—কোথাও গীত বাদ্য চলিতেছে—কোথাও অদ্ভুৎ তামাসা আরম্ভ হইয়াছে। পুরির বহির্দ্দেশ তামসীক আমোদে পরিপূরিত।

দেখিতে দেখিতে পুরির অভ্যন্তরভাগ যাত্রীগণে ছাইয়া পড়িল। সকলেই প্রায় স্নাত এবং দেবীদর্শনেচ্ছু। নাট মন্দিরে ব্রাহ্মণগণ সারি সারি উপবেশন করিয়া স্বীয় স্বীয় পূজা করিতেছেন। কেহ যজমানের মঙ্গলকামনায় স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিয়াছে—কেহ চণ্ডীপাঠ করিতেছে—কেহ স্তব পাঠ করিতেছে—কেহ অনন্য মনে নিকটস্থ কোন যুবতীর মনোহর রূপলাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া আছে—কেহ তীব্র কটাক্ষ বিক্ষেপে কোন যুবতীকে স্বীয় হৃদয়োদ্ভব মলিন ভাব জ্ঞাপন করিতেছে—কেহ বা ললাটেশ্বরীর-দিকে মুগ্ধদৃষ্ট হইয়া বাহ্যিক জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছে—কেহ বা মন্দিরের দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তি গদ গদ স্বরে মা মা শব্দে মন্দির প্রতিধ্বনীত করিতেছে ও দুনয়নে অনবরত ভক্তিবারি বিগলিত হইতেছে। ধুপ দীপ ধুনা ও কর্পূর দগ্ধবাসে মন্দির ও পুরি আমোদিত এবং শঙ্খ ঘণ্টা ও কাংস্যের বাদ্যে দেবালয় পরিপূরিত। পূর্ব্বে উৎসবোপলক্ষে পুরি মধ্যে ছাগমেষাদি বলি হইত, কিন্তু দেবালয়ে বনমালী স্বামী মহাশয়ের অবস্থানাবধি বলি এক প্রকার

উঠিয়া গিয়াছে, কেবল রাণি ভবাণীর নামে একটী করিয়া বলি হইয়া থাকে। ক্রমে বেলা তৃতীয় প্রহর উপস্থিত, দেবীর ভোগ হইয়া প্রসাদাদি বিতরিত হইয়া গিয়াছে, কাঙ্গালি ভোজন ও সমাপ্ত হইয়াগিয়াছে। ক্রমে দু একটী করিয়া যাত্রী, গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে—ক্রমে পুরি মধ্যে যাত্রীর ভাগ কমিয়া আসিল। স্বামীমহাশয় মন্দিরের বহিঃপ্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন, সন্নিকটেই ইন্দুভূষণ উপবিষ্ট।

বনমালী স্বামী পরমানন্দে মগ্ন। একতারা সংযোগে পরমাত্মতত্ত্বগীত গাহিতেছেন। লোকে লোকারণ্য। স্বামী মহাশয় বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন। ভগবদ্ভক্তি গীতে জনসমূহ বিভোর। গীত এবার থামিয়াছে, স্বামী মহাশয় একতারা ইন্দুভূষণকে প্রদান করিয়াছেন। ইন্দুভূষণ একতারা হস্তে উপবিষ্ট। ইন্দুভূষণ দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে একটী গীত ধরিয়াছেন, সেটী শেষ হইতে না হইতে হৃদয়াবেগের সঙ্গে সঙ্গে একটী বৈরাগ্যপথাবালম্বির গীত আপনাপনি ইন্দুভূষণের কণ্ঠ হইতে বিনিসৃত হইল। সেটী মধুর—অতি সারগর্ভ এবং চরম সময়ের গীত। স্বামীমহাশয় এই গীতে বড়ই পরিতুষ্ট হইলেন, মনে মনে ইন্দুভূষণকে অতিশয় প্রশংসা করিলেন, বুঝিলেন ইন্দুভূষণ পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ইন্দুভূষণ পূর্ণ সন্ন্যাসী, সংসার সীমা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অত্যল্প সময় মধ্যেই পরম যোগে সমাসীন হইবেন, ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া আসিতেছেন, প্রশ্বাস কমিয়া আসিয়াছে। হৃদয় তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ হইয়াছে। পিপাসার শান্তি হইয়াছে, এক্ষনে আপনায় আপনি বিভোর। ইন্দুভূষণ ক্লেশের অতীত কারণ ইন্দুভূষণ নিষ্কাম। ইন্দুভূষণের বাহিক আমোদ ভাল লাগেনা—জনতা ভাল লাগেনা—আত্মীয়স্বজন ভাল লাগেনা—সংসারের কোলাহল ভাল লাগেনা। ইন্দুভূষণ সন্ন্যাসী—ইন্দুভূষণ বৈরাগী। বহুদিন হইতে ইন্দুভূষণভোগে বীতস্পৃহ—তাঁহার আশা নাই—লালসা নাই—বাসনা নাই। স্বামী মহাশয়, গীত শেষ হইলে ইন্দুভূষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্ঞানানন্দ!" স্বামী মহাশয় ইন্দুভূষণকে জ্ঞানানন্দ অভিধান দিয়াছেন, তাই বলিলেন "আজ আনন্দময়ীর কৃপায় কি প্রকৃত আনন্দ উপভোগ হইতেছে?

জ্ঞানানন্দ। "প্রভো! অধিক অনধিক তো বুঝি না; আনন্দ সাগরে অহর্নিশিই ভাসিতেছি।"

স্বামী। "তাই তোমায় জ্ঞানানন্দ অভিধান দিয়াছি। যোগাবস্থায় পূর্ণানন্দ আসে, এখন তোমার পূর্ণ যোগাবস্থা। চৈতন্যোদয়ে পূর্ণজ্ঞান বিকশিত হইয়াছে। পবন যোগে জীবাত্মা পরমাত্মায় সংযুক্ত হওয়ায় পরমানন্দ সম্ভোগ করিতেছ। তোমার সময় উপস্থিত হইয়াছে মুক্তির বিলম্ব নাই। ব্রহ্মজ্ঞান লাভই জীবন্মুক্ত অবস্থা।"

ইন্দুভূষণ। "প্রভো! সহজেই অনবরত পরমানন্দ সম্ভোগ হইতেছে, তবে কেন আনন্দ লাভের জন্য উৎসবের আবশ্যক?"

স্বামী। "দিবালোকে আঁধারের জ্ঞান আসেনা, যাহারা অন্ধকারে থাকে তীব্রালোক প্রবিষ্ট হইবামাত্র কিছুই দেখিতে পায় না, ক্রমে নয়নজ্যোতি দীপ্তিমান হইলে সকলই দেখে। তোমার মোহান্ধকার বিদূরিত হইয়াছে তাই বুঝিতে পারিতেছনা। মোহান্ধকারে মুগ্ধ জীবের ক্রমে ক্ষীণজ্যোতি ধারণা করিতে করিতে পূর্ণালোক ধারণা করিবার ক্ষমতা আসে। তাই বদ্ধজীবের হৃদয়ে পরমানন্দ প্রোক্ষিত করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে উৎসব ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। তাই বঙ্গের ঘরে ঘরে দুর্গোৎসব; তাই ভারতে নন্দোৎসব এত প্রচলিত।"

ইন্দুভূষণ। "লালসার শান্তি নাই, এবং পার্থিব সুখ অবিরাম ভাল লাগেনা, কিন্তু পরমানন্দের বিরাম নাই এবং শান্তিময়?"

স্বামী। "বদ্ধজীব লালসাপূর্ণ, মুক্তজীব ভোগবিরহিত সুতরাং শান্তিময়।

ইন্দুভূষণ। "বদ্ধজীবে ও মুক্তজীবে প্রভেদ কি?"

স্বামী। "বদ্ধজীব মহামায়াময় সংসারী, মুক্তজীব ত্যাগী এবং নিষ্কাম। সময় আসিলে সকলেই মুক্তজীব হইবে। কর্ম্মসূত্রে মানব পরিচালিত। কর্ম্মসূত্র ত্যাগ না হইলে মানব মুক্ত নহে। কামনা ত্যাগেই মুক্তি। কামনা যুক্তে ভোগ। কামিনী কাঞ্চন বন্ধনের কারণ, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগই মুক্তির সোপান। গীতায় স্বয়ং ভগবান দেখাইয়াছেন "তিনিই ভববন্ধনের কারণ,

আবার তিনিই বন্ধন ছেদনের একমাত্র উপায়; যে তাঁহাকে বাঁধিতে পারিয়াছে সে ভবার্ণব পার হইয়াছে।" গোপিনীগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম ডোরে বাঁধিয়াছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কর্ণধার হইয়া অবলা অসহায়া গোপবালাদের ভবসিন্ধু পার করিয়াছিলেন। বদ্ধ যশোমতী গোপালকে সামান্য সন্তান ভাবিয়া গোপালের কোমলকর বন্ধন করিয়া ছিলেন, তাই চিরবদ্ধ গোপাল, গোপাল বেশে অন্তে যশোমতীর ভববন্ধন মোচন করিয়াছিলেন। অতএব বদ্ধ না হইলে মুক্তি আসে না, তবে কাহারও অগ্র কাহারও বা পশ্চাৎ, সেইটীই কর্ম্মসূত্র অথবা প্রাক্তন।"

ইন্দুভূষণ। "সত্যই একমাত্র নিত্য, সত্য ভিন্ন সকলই অনিত্য তবে কেন মানব সত্য ছাড়িয়া অনিত্যের সেবা করে?"

স্বামী। "ঘোর মায়া প্রভাবে অনিত্য পদার্থকে নিত্য বলিয়া ধারণা হয়, সুতরাং ঐ স্থান হইতেই সত্য বিচ্যুত হয়, সে সত্য পুনঃ প্রাপ্তির জন্য মানব ঘুরিয়া ঘুরিয়া জন্মের পর জন্ম পরিগ্রহণ করে।"

ইন্দুভূষণ। "জীব কত জন্ম পরিগ্রহের পর দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করে?"

স্বামী। "অশীতি লক্ষ জন্ম পরিগ্রহের পর উৎকর্ষতা লাভ করিয়া দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করে। এই মানব জন্মের মধ্যে পুরুষ জন্মই উৎকৃষ্ট। তাহার মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ জন্ম অতীব দুর্লভ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট জন্ম। এমন উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ জন্ম লাভ করিয়াও মানব শ্রীয়হীন কর্ম্ম বলে আবার অধঃপতিত হইয়া নীচ জোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় দুষ্ক্রিয়ার খণ্ডন করে।"

ইন্দুভূষণ। "প্রভো! একটী প্রশ্ন সহসা মনে উপজিত হইল। মানবের পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহণ দ্বারাই যদি সকৃত পাপের খণ্ডন হয়, তবে স্বর্গ নরক ভোগের আবশ্যক কি? স্বর্গ নরক সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাই বা কোথায়?"

স্বামী। "স্বর্গ নরকের প্রয়োজন আদৌ নাই, বেদে কথিত আছে, স্বর্গ নরক কেবল আকাশ কুসুমবৎ অনিত্য শব্দ বিন্যাস মাত্র। আর্য্যধর্ম্ম এত গভীর, এত সারবান, তাহার এত বাঁধাবাধি, যে পাছে সামান্য বুদ্ধি মানব ঘোর পাপী হইয়া উঠে সেই আশঙ্কায় পূর্ব্বাপর শাস্ত্রকারগণ পাপ ভোগের জন্য বিভীষিকা-

পূর্ণ নরকের কল্পনা করিয়াছেন এবং পুণ্য ভোগের জন্য নিত্য সুখপ্রদ কল্পিত স্বর্গধামের বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।”

উভয়ে এই রূপ গভীর শাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে এমন সময় আরতির জন্য দুন্দুভীধ্বনি হইয়া উঠিল। অদ্য অন্য দিনের ন্যায় তোরণ দ্বার বন্ধ হইবেনা, তিন দিন পুরিদ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। অধিক লোক সমাগমের জন্য ঐ দিবসত্রয় হিংস্র জন্তুগণ যাত্রীগনের উপর হিংসা করিতে অক্ষম বিধায় যাত্রীগণ নির্ব্বিঘ্নে দলে দলে পূর্ণিমার সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় পুবির বাহিরে শয়ন করিয়া আনন্দে রাত্রি যাপন করে। পুরি মধ্যে একটা কলরব পড়িয়া গেল, সুতরাং স্বামী মহাশয় ও ইন্দুভূষণ ধর্ম্মচর্চ্চাত্যাগ করিয়া মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন, অদ্য স্বামী আরতি করিবেন, আবতিকালীন পুরি মধ্যে আর লোক ধরেনা, সে অপূর্ব্ব আবতী দেখিতে সকলেই অগ্রসর। স্বামীজী মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই আসনে উপবেশন করিলেন এবং দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তাবস্হ আরতী আরম্ভ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

গভীরা রজনী, শুক্লপক্ষ হইলেও মেঘাড়ম্বরে ঘোর তামসী—ভয়ঙ্করী নিশা! আকাশে নক্ষত্রের নাম নাই—পথে লোক সমাগম নাই। এই আতঙ্কময়ী নিশীথ সময় কে এই প্রদেশে? উভয় পার্শ্বই রমণী—একটী ভীতা—সঙ্কুচিতা—অথচ চঞ্চলা—অপরা চপলা—চতুরা—নির্ভিকা। একটী চিত্রবিচিত্রাঙ্গ কালকূট ভরা ভুজঙ্গিনী—অপরা তীক্ষ্ণ দন্তাবৃশ্চিক। উভয়ে গভীরা তামসী

রজনীতে অসীম কান্তার পার হইয়া ক্রমাগত জাহ্নবী তীরাভিমুখে গমন করিতেছে। একটী সঙ্গিনী এক এক বার দূরে কোন ছায়া দর্শনে চকিত ভাবে থমকিয়া দাঁড়াইতেছে—অমনি অপরা সঙ্গিনী বলিতেছে,, "ভয় কি মালু এযে আমার চেনা রাস্তা! এখানে চোর ডাকাতের ভয় নেই—বাঘ ভালুকের ভয় নেই—নষ্ট দুষ্ট লোকের ভয় নেই।" অপরা শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর করিল "ভয় নাইও বটে ভয় আছেও বটে। লোক জনের ভয় বড় কবিনা তবে উপরি দেবতাকে ভয় হয়।" প্রথমা সহাস্যে উত্তর করিল "যার কাছে যাচ্চি তার নামে উপরি দেবতার ভয় নাই।" দ্বিতীয়া উত্তর করিল "বোন তাই হলেই বাঁচি—ঐটেতেই আমার ভয়।"

প্রথমা। "কি জানি কাঁচা বয়েস যদি পেয়ে বসে?"

দ্বিতীয়া। "তুমি কি আমার চেয়ে ডাসান নাকি? যাহোক দূর কত?"

প্রথমা। "আর বড় অধিক দূর নয়, ঐ যে সামনে আলো দেখিতে পাচ্চো ঐখানে আমাদের যেতে হবে।"

দ্বিতীয়া। "সই এত পুঁটলি পাটা কিসের?"

প্রথমা। "যোগ সংযুত চাইনা? তোমার কাযতো সহজ নয়, দুর্গোৎসবের ব্যাপারের চেয়েও অধিক।"

পাঠক প্রথমা রমণী আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা সৌদামিনী এবং দ্বিতীয়া অপর কেহ নহে চপলা মালতী।

মালতী। "সই কায সিদ্ধ হবেতো? দেখিস বোন যেন খাটুনি সার না হয়?"

সৌদামিনী। "চেষ্টাতো হোল, এখন তোমার অদৃষ্ট আর আমার হাতযশ।"

মালতী। "এখন হিঁদলি ছুড়ির বাদ উঠলে তবে আমার মনস্কামনা সিদ্ধি হবে, বড় দাগা দিয়েছে—ভারি তেজ—ঢের বড়মানুষ লোক আছে, কিন্তু এত তেজ এত অহঙ্কার কারও দেখিনি, ধর্ম্মে সইলে হয়।"

সৌদামিনী। "বোন! রাণীও একদিন বাঁদি হয়—সবই অদৃষ্ট বৈত নয়?"

উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইত্যবসরে অদূরে অভ্রভেদী এক চিৎ-কার শ্রুতি গোচর হইল, উচ্চৈশ্বরে ধ্বনিত হইল, "মাভৈঃ মাভৈঃ" এই অমানুষী

চিৎকার ধ্বনি প্রান্তর বিদীর্ণ করিল। অদূরস্থিতা ভাগীরথী সেই ভীষণ চিৎকারে প্রতিধ্বনিত হইল, মাভৈঃ মাভৈঃ। চপলা, চতুরা মালতী নির্ভিকা হইলেও কম্পিতা হইল৭ আপাদ মস্তক কাঁপিতে লাগিল—মস্তকে উষ্ণশোণিত প্রধাবিত হইল–ভয়ে মালতীর তালু শুষ্ক হইয়া আসিল। মালতীর মুখে কথা নাই দেখিয়া সৌদামিনী বুঝিল মালতী ভীতা হইয়াছে। ক্ষীণ চঞ্চল তড়িত প্রভায় দেখিল মালতী কাঁপিতেছে—অধর বিকম্পিত হইতেছে—হস্ত পদাদি বিকম্পিত হইতেছে। অমনি সৌদামিনী মালতীকে অঙ্গে ধারণ করিয়া কহিল "মালতি! ভয় পাইয়াছ? ভয় নাই, কোন সাধু শবসাধন করিতেছে ও অদূরে তাঁহার গুরুদেব শিষ্যের ভয়াপহরণ জন্য আশ্বাস বাক্য কহিতেছেন, ভয় নাই! ভয় নাই! শিষ্যও গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস বশতঃ হৃদয়োদ্ভব আতঙ্ক বিদূরিত করিয়া স্বীয় ইষ্ট সাধনায় নিমগ্ন হইতেছে।"

মালতী বিশেষ আতঙ্কিত হইয়াছে, সুতরাং সহসা প্রকৃতিস্থ হইতে পারিল না। সৌদামিনীর সাহায্যে কথঞ্চিৎ ক্ষীণতর গতিতে চলিতে লাগিল, অল্পসময় মধ্যেই সৌদামিনী মালতীকে লইয়া একটী কুটীরে প্রবিষ্ট হইল, কুটীরের দ্বার উন্মুক্ত ছিল, প্রবেশ করিতে বিলম্ব হইল না, কুটীরে প্রবেশ করিয়াই মালতী বসিয়া পড়িল, তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, অর্দ্ধস্ফুটস্বরে মালতী জল চাহিল, কটীতে কৌষের বস্ত্রধারী সশ্মশ্রু লম্বিত-কেশধারী এক সন্ন্যাসী নারিকেল পাত্রে বারি লইয়া মালতীকে প্রদান করিল। তৃষ্ণায় মালতীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, এক মুহূর্ত্তেই সন্ন্যাসী প্রদত্ত বারি পান করিয়া ফেলিল। বারি পান করিয়াই মালতী প্রকৃতিস্থা হইলেন, আর ভয়ের লেশ নাই, সন্ন্যাসী দত্ত বারিতে কি গুণ আছে যে মালতীকে এত সত্বর প্রকৃতিস্থা করিল

সৌদামিনী বুঝিল ঔষধে উপকার করিয়াছে, মৃদুস্বরে কহিল মালতি! ভয় দূর হইয়াছে? তৃষ্ণা নিবারণ হইয়াছে?"

মালতী সহাস্যে উত্তর করিল "সন্ন্যাসীর জলের গুণ আছে।"

সৌদামিনী। "শুধু জল কেন মালু! সন্ন্যাসীর সকলই গুণ।"

মালতী। "মরি মরি! গুণের আধার।"

সৌদামিনী। "সাধু আমাদের ত্রিগুণাতীত।"

মালতী। "না, না, সদু! কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন।

সন্ন্যাসী। "জীবমাত্রেই গুণের মধ্যবর্ত্তি তবে যখন জীব শিব হয় তখনই জীব ত্রিগুণাতীত।"

মালতী। "সে ভাব কখন হয়?"

সন্ন্যাসী। "যখনই জীব চক্রবর্ত্তি"।

মালতী। "চক্রবর্ত্তী বামুন"।

সন্ন্যাসী। "তাই বটে! তবে তারা যা করে চক্রবর্ত্তী হয়েছে তাকে চক্র বলে"।

মালতী। "সাপের চক্র"?

সন্ন্যাসী। "দেহের ষটচক্র ভেদ করিতে হইলে চক্ররচনা করিয়া সাধনা করিতে হয়"।

মালতী। "চক্রই বুঝিনা"।

সৌদামিনী। "চক্রের জন্যই আমরা এখানে এসেছি। সেই চক্রের বলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে"।

মালতী। "চক্রের এত বল, এই থেকে বুঝি সব চক্রের নাম হয়েছে"

সৌদামিনী। "স্বামীজি! কার্য্যের বিলম্ব কি?"

সন্ন্যাসী। "আর বিলম্ব কি? সময় প্রায় সমুপস্থিত, আয়োজন স্থানে বসলেই হয়। আজ আর শ্মশানে বসা হবে না, আগন্তক ভীত হবে। ক্রমে গৃহ প্রাঙ্গণে সাধনায় সিদ্ধ হলে শ্মশানে যেতে হয়, একেবারে শ্মশান প্রশস্থ নয়।"

সৌদামিনী। "গৃহের বাহিরেই আয়োজন করা যাক"।

তথাস্তু বলিয়া সন্ন্যাসী গাত্রোত্থান করিয়া সাধনোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া সৌদামিনী ও সন্ন্যাসী ঝটীতি বাহিরে গমন করিল এবং অল্প সময় মধ্যে পূজার আয়োজন সমাধা হইল। সৌদামিনী পুনঃ কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মালতীকে পূজাস্থানে লইয়া গেল। ষোড়শোপচারে পূজা আরম্ভ হইল। পূজা শেষ হইলে, চক্র মধ্যে পাত্র পাত্র মর্ত্ত্য সুধা ফিরিতে লাগিল।

দুই তিন পাত্রেই মালতীর মত্ততা আসিল। মালতী সজ্ঞা বিরহিতা হইয়া চক্র মধ্যে নিপতিতা রহিল। ক্রমে সকলেই উন্মত্ত হইয়া উঠিল, ইত্যবসরে সন্ন্যাসী কহিল "আগামী পরশ্ব নলহাটীতে মেলা হবে এই রাত্রে গোযানে রওনা হলে তবে সময়ে পহুঁছান যাইবে, যদি মেলায় যোগদানে ইচ্ছা থাকে প্রস্তুত হও"।

মালতী। "সেখানে না কি এক ভারি গোছের স্বামীজি আছে? তিনি যাকে যা বলেন তার না কি তাই ফলে? ব্যাধিগ্রস্থ তাঁকে স্পর্শ করলে না কি রোগ মুক্ত হয়"?

সন্ন্যাসী। ভারি সাধু! বনমালী স্বামীর ন্যায় সাধু আর দেখা যায় না।"

সৌদামিনীর হৃদয় বনমালী স্বামী দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়া উঠিল, এবং সাধুকে গোযান আনয়নার্থ আদেশ করিল। সন্ন্যাসী কহিল "গোযান প্রস্তুত আছে তবে তোমার সঙ্গিনীকে লইয়া কি করিব"?

সৌদামিনী। "সঙ্গিনীকে সঙ্গে লইতে হইবে"।

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর সাধু ও সৌদামিনী সজ্ঞা বিরহিতা মালতীকে উত্তোলন পূর্ব্বক গোযানে স্থাপিত করিল এবং আপনারা তাহাতে উপবেশন করিয়া নলহাটী গ্রামোদ্দেশে রওনা হইলেন।

সে রাত্রি অতিবাহিত হইল, পরদিবসও কাটীল তথাপি মালতীর সজ্ঞা নাই। পর রাত্রের শেষে তাহারা নলহাটী পঁহুছিয়া গোদ্বয় যান মুক্ত করিলেন। কিছু পরে মালতীর সজ্ঞা হইলে চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখিল সে বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে গোশকট যানে পড়িয়া আছে, শকট গোমুক্ত হইয়া পড়িয়া আছে, ক্রমে প্রকৃতিস্থা হইয়া অনুভব করিল প্রান্তর লোকে লোকারণ্য। ক্ষণপরে সৌদামিনী শকটের নিকট আসিল, সৌদামিনীকে দেখিয়া মালতী বিস্ময়ে কহিল "সহু! কোথায় আসিলাম! রাত্রি কি প্রভাত হইয়াছে?"

সৌদামিনী মালতীকে প্রাপ্তজ্ঞান দেখিয়া আনন্দিত হইল, সে মনে করিয়াছিল, মালতী কখন মাদক দ্রব্য পান করে নাই, সেই জন্য এত বিহ্বলা হইয়াছিল, যাই হউক সে প্রকৃতিস্থ হইলেই বাঁচি।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যোদয় হইল, প্রান্তর যাত্রীগণে পুরিয়া গেল, সকলের মুখেই "জয় বনমালী স্বামীজীকা জয়" সৌদামিনী কহিল "মালতী আমরা রাত্রে রওনা হইয়া নলহাটী আসিয়া পৌছিয়াছি, আজ এখানে এক মস্ত মেলা।" মালতী গত রাত্রের কথা ভাবিতে না ভাবিতে যাত্রীগণের কোলাহলে তাহার সে ভাবনা ডুবিয়া গেল। মালতী নূতন দৃশ্যে মন ফিরাইয়া পূর্ব্বস্মৃতি অন্ধকার মত ভুলিয়া যাইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

অদ্য মেলার তৃতীয় দিবস, দেবালয় লোকে লোকারণ্য, শেষ দিবস বলিয়া আজ বহু লোকের সমাগম হইয়াছে—পুরি মধ্যে লোক আর ধরেনা। বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ, এমন সময় নাট্যমন্দিরের নিকট মহা গোলোযোগ বাঁধিয়া গিয়াছে। কেহই কিছু বলিতে পারিতেছেনা, অথচ সকলেই সেই স্থানে সমবেত হইতেছে। ক্রমেই সেই স্থানে জনতার বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্রমে শোনা গেল একজন লোক ধরা পড়িয়াছে। কে সে লোক? এবং কাহারাই বা ধরিয়াছে তাহার ঠীক নাই। কেহ বলিতেছে "কোন দেশের রাজা সন্ন্যাসী হয়ে পালিয়ে এসেছিল," কেহ বলিতেছে "সেই সন্ন্যাসী কম-লোক নন, তিনি রাজা! অনেক দিন রাজপাট ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল, অনেক সন্ধানের পর আজ ধরা পড়েছে"।

পুরিরক্ষকগণ ক্রমে গোল থামাইয়া ফেলিল। জনতা ক্রমে অপসারিত হইলে শেষে দেখা গেল ইন্দুভূষণ উপবিষ্ট, চরণ ধরিয়া পদতলে এক বৃদ্ধ পতিত হইয়া রহিয়াছে।

জনতা কমিয়াছে, এবার উভয়ের কথোপকথন শোনা যাইতেছে।

বৃদ্ধ! "রাজাবাবু! তোমার মনে কি এই ছিল? এই জন্যে কি বুড়োর গলায় ফাঁসি চড়াইয়া আপনি সংসার থেকে সরিয়া পড়িয়াছ"?

ইন্দুভূষণ নীরব, মুখে কথা নাই, শরীর স্পন্দিত হইতেছে, মস্তকাবনত করিয়া নিম্নদিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। কি মধুর দৃশ্য! যেন ধবল গিরি-শৃঙ্গ উন্নত মস্তকাবনত করিয়া নিম্ন গিরি শৃঙ্গের দিকে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছেন।

হলধর ইন্দুভূষণকে নীরব দেখিয়া উত্তর করিল "রাজাবাবু! আমি যখন দেখা পাইয়াছি আর ছাড়িব না, আমার সহিত বাটী ফিরিয়া যাইতে হইবে"।

ইন্দুভূষণ এখন ও নীরব অথচ হাস্য গম্ভীর বদন, স্থির গভীর অর্ণববারি সামান্য লোষ্ট্রপাতে বিচলিত হয় না, ইন্দুভূষণের হৃদয়ও সামান্য সাংসারিক মায়িক কথায় বিচলিত হয় নাই। কে কাহার দারাপত্য? কাহার ধন সম্পত্তি? কাহাকে লইয়াই বা সংসার! ইন্দুভূষণ আর সংসারী নহেন্। মায়া পাশ ছেদন করিয়াছেন—বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন—দারাপত্য ত্যাগ করিয়াছেন। অহংত্যাগী ইন্দুভূষণ পরম বৈরাগী—চিন্ময় ব্রহ্মানন্দে প্রতিনিয়ত ভাসমান। ইন্দুভূষণ সতত‌ই পরমানন্দ, রাগ দ্বেষাদি বিবর্জ্জিত। সামান্য বাত্যায় সুগভীর প্রশান্ত মহাসাগরের উর্দ্ধতন বারিস্তরে বীচিমালা প্রক্ষিপ্ত হয় মাত্র, তাহাতে কি সুগভীর জলধী আলোড়িত হয়? সংসার মায়ার খেলা—অগাধ সাগরের উর্দ্ধতন প্রদেশস্থ প্রক্ষিপ্ত বীচিমালা মাত্র—সুনির্ম্মল দর্পণে বাহ্যবস্তুর প্রতি-বিম্ব মাত্র। ইন্দুভূষণ যখনই সংসার হইতে অপসৃত হইয়াছেন, তখনই মায়ার বস্তু তাঁহার হৃদয় দর্পণ হইতে অপসারিত হইয়াছে। ইন্দুভূষণ আর মায়ার খেলা খেলিবেন না, সুতরাং বৃদ্ধের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না।

বৃদ্ধ আবার কহিল "ইন্দু! রেখা ও চপলা কাঁদিয়া সারা হইতেছে, তাহাদের অস্ফুট ক্রন্দন স্বরে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাদের কথা কি একবার মনে উঠেনা? তুমি ভিন্ন তাহাদের আর কে দেখিবে"? এবার ইন্দুভূষণ উর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। বৃদ্ধ বুঝিল ইন্দু দেখাইল ভগবান আছেন, তিনিই দেখিবেন। যিনি অসংখ্য কীটানুকীটকে প্রতিপালন করিতেছেন, তিনি কি রাজপুত্রকে দেখিবেন না? বৃদ্ধ কহিল "ভগবান আপনার হস্ত প্রসারণ করিয়া জীবের অভাব মোচন করেন না, রক্ষা করেন না। দয়ালু জীব উপলক্ষ হইয়া জীবে দয়া প্রকাশ করে; তুমি শৈশব, বালকদিগের পিতা ও রক্ষা-কর্ত্তা; তুমি পালন না করিলে কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করা হইবে। তাই বলি তোমার মুখাপেক্ষীদিগকে প্রতিপালনের জন্য ও সংসারে চল"। এবার ইন্দুভূষণ আর নীরব থাকিতে পারিলেন না, ধীরে বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তর করিলেন।

কেহ কাহার ও প্রতিপাল্য নহে, মানব ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র কীট মাত্র, জীব কর্ম্মসূত্রে ভোগ করে। মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ঈশ্বর চিন্তা—সংসারের সার গ্রহণ। মৃন্ময় হইতে চিন্ময় পরমব্রহ্ম ভাবিয়া লইতে হইবে—দারাপত্য পরিবার হইতে সৃষ্টি কর্ত্তার অপার করুণা ভাবিয়া লইতে হইবে—বিশ্বের আদি কারণ স্থির করিয়া লইতে হইবে—সেই চিন্তার দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি হইলে অন্তঃসার হীন অসার সংসার ছাড়িয়া দিবে, আর আবশ্যক হইবে না। জড় হইতে জড় কারণ অজড়বস্তু ভাবিয়া লইতে হয়। ডিম্বস্থ জীব পূর্ণ জীবাকার ধারণ করিলে আবরণ পরিত্যাগ করিয়া বাহির হয়, আর আবরণ মধ্যে থাকে না। জীব সংসারে থাকিয়া পূর্ণ-জ্ঞান লাভ করিলে আর সংসার মধ্যে থাকে না। হলধর! আর কেন আমায় ডিম্ব মধ্যে প্রবেশ করাইতে প্রয়াস পাও"।

পাঠক! বৃদ্ধ আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত হলধর। হলধর বহুস্থান পর্য্যটন করিয়া বহু অনুসন্ধানের পর ললাটেশ্বরী-দেবীমন্দিরে ইন্দুভূষণের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। পিতৃ মাতৃহীন ইন্দুভূষণকে হলধর শৈশব হইতে প্রতিপালন করিয়াছেন, সুতরাং ইন্দুভূষণের উপর হলধরের অপত্য স্নেহ সঞ্জাত হইয়াছিল, তাই হলধর ইন্দুভূষণকে স্বপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন ও আন্তরিক

ভাল বাসিতেন। ইন্দুভূষণ ও হলধরকে পিতৃতুল্য ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। সামান্য ভৃত্যের ন্যায় জ্ঞান করিতেন না। হলধর রাজসংসারের অর্থ স্বীয় শোণিত স্বরূপ জ্ঞান করিত এবং অকপটে রাজভাণ্ডার পূর্ণ করিতে সতত চেষ্টা করিত। হলধর অর্থগৃধ্নু হইলে স্বয়ং প্রভূত অর্থ আত্মসাত করিয়া ধনী হইতে পারিতেন, কিন্তু ধর্ম্ম পরায়ণ হলধরের আদৌ সে নীচ প্রবৃত্তি ছিলনা। বয়স্থ হইয়া ইন্দুভূষণ যখন রাজ্য ভার গ্রহণ করিলেন, হলধর তদবধি ইন্দুভূষণকে প্রভু স্বরূপ সন্মান প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজভার প্রাপ্ত হইয়া বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া ও ইন্দুভূষণ হলধরকে এক নিমেশের জন্য অবজ্ঞা সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতেন না বরঞ্চ অধিকতর ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। হলধরের কথায় ইন্দুভূষণ কখন প্রতিবাদ করেন নাই। সেই আশ্বাসে হলধর আজ ইন্দুভূষণকে ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য এতদূর জেদ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দুভূষণ স্বজন ত্যাগী—সম্পদ ত্যাগী—কেন তাঁহার সংসারে পুনঃ প্রবেশ বাসনা হইবে ? এ বিষয়ে আজ ইন্দুভূষণ হলধরের কথা রাখিতে পারিলেন না। হলধর দেখিলেন ইন্দুভূষণ তাঁহাকে তর্কে পরাস্থ করিলেন সংসারের অনিত্যত্ব বুঝাইয়া দিলেন, বলিলেন "পুত্র কলত্রের মায়া নিদ্রাবেশে সুখস্বপ্ন মাত্র, ধন জন যৌবন অলিক ছায়া মাত্র। সংসার বিভীষিকা পূর্ণ তাহাতে উন্মত্ত হইলে আত্মজ্ঞান হারাইয়া যায়—সংসার খেলায় জিতিতে পারিলেই হাতের পাঁচ থাকিয়া যাইবে, তাহাই ভবিষ্যতের—পরকালের সম্বল মাত্র। মায়িক সঞ্চিত সম্পত্তি, সম্বল নহে। ঐ মায়ের রাঙ্গা চরণই পরকালের একমাত্র সম্বল।" হলধর নীরব হইয়া রহিল। ইন্দুভূষণ বলিতে আরম্ভ করিলেন "তাই বলি হলধর! আর সংসার সংসার করিয়া ঘুরিওনা কেশপক্কতা প্রাপ্ত হইয়া শুক্ল হইয়াছে, দন্ত গলিত হইয়াছে, মাংস পলিত হইয়াছে, এদেহের শীঘ্রই অবসান হইবে, বল দেখি এদেহ লীলায় কি সঞ্চয় করিলে ?

হলধর কি উত্তর করিবেন, ইন্দুভূষণ যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার উত্তর দান সংসারীর পক্ষে সহজ নহে, সুতরাং হলধর নীরব রহিলেন বটে, কিন্তু তড়িত প্রবাহের ন্যায় শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে সেই গভীর প্রশ্ন প্রবাহ

প্রবাহিত হইল, যেন নয়নে মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী ছায়া ঘুরিতে লাগিল ; মৃত্যুর পর কি হইবে, কোথায় যাইব, সেই অভাবনীয় ভাবনায় হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, আর যেন হলধরের হৃদয় সংসারে ফিরিতে চাহেনা, আর যেন মন রাজ-বাটীর দিকে ধাবিত হইতে চাহেনা, যেন চক্ষু মুদিয়া দেবীমন্দিরের একপার্শ্বে বসিয়া থাকি, যেন ইন্দুভূষণের চরণ প্রান্তে পতিত থাকিয়া আত্মমায়াময় জীবন সার্থক করি. ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় থাকিয়া হলধর আপনাপনি অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল "আবার ডিম্বে প্রবেশ করিব ? এ খেলায় আমার হাতের পাঁচ রহিলনা ?—সংসার অনিত্য—দারাপত্য মায়ার পুতলি—সংসার মায়ার খেলা !" এবার স্বর ফুটিয়া উঠিল—ফুটন্তস্বরে আপনাপনি কহিয়া উঠিল "কৈ তবে অনাথের—দুর্ব্বলের—ভিখারীর সম্বল—মায়ের রাঙ্গা চরণ কৈ ? কৈ রাঙ্গা চরণ ! কৈ রাঙ্গচরণ ! ইন্দু ! কৈ অভয় পদ ? আমি অন্ধ হইয়াছি ! দেখাও ? দেখাও ? রাঙ্গাচরণ ! ভাই সকল রাঙ্গাচরণ !" ইন্দুভূষণ হলধরের কাতরোক্তিতে—সহসা প্রেম বৈরাগ্যে—প্রেমোন্মত্ত বচন লহরীতে উন্মত্ত হইয়া, সেই সুরে যোগ দিয়া বলিয়া উঠিল "মায়ের রাঙ্গাচরণ ! মায়ের রাঁতুল চরণ দুখানি ভবসিন্ধু পারের তরণি !"

দেবালয় মধ্যস্থিত জনতা বলিয়া উঠিল "রাঙ্গা চরণ দুখানি" "রাঙ্গা চরণ দুখানি !" যেন যাত্রী মধ্যে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল, যেন কি তড়িত প্রবাহে সকলের শিরায় শিরায় ধমনিতে ধমনিতে প্রবাহিত হইয়া ধ্বনিত হইল "রাঙ্গা-চরণ দুখানি !" বনমালী স্বামী সেই আনন্দে যোগ দিয়া উন্মত্তবৎ নাচিতে ২ বলিল, "রাঙ্গাচরণ দুখানি" সেই সময় দেবালয় শুদ্ধ যাত্রীর দল দেখিল যেন সসাগরা পৃথিবী মহাশ্মশান ও সেই মহাশ্মশানে একা ললাটেশ্বরী যেন নৃত্য করিতেছেন অন্য জীব মহাশিব পার্শ্বে ধুল্যবলুণ্ঠিত, দেবী এক একবার সকলকে রাতুলচরণ দেখাইয়া যেন ঈঙ্গিতে বলিয়া দিতেছেন এ সংসার শ্মশান সম, এই চরণই একমাত্র আশ্রয়। মালতী পূর্ব্ব কথিত ভৈরবের সহিত এই মেলায় আসিয়াছিল, সে সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিল। সে কাহার অনিষ্টের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল ? যাহার আশ্রয় ঐ রাঙ্গাচরণ, জগতে কে তাহার অনিষ্ট

করিতে সক্ষম—দিবা অবসান হইয়া রাত্রি আসিল—শান্তিময়ী যেন শান্তিবারি প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন। সকলেই ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। দেবালয়ের কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। এতক্ষণ দেবালয় তমসাচ্ছাদিত ছিল, দুএকটী করিয়া দীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া দেবালয় দীপমালায় পরিশোভিত হইল। প্রহরী প্রহর বাজাইল—তোরণদ্বারে নহবৎ বাজিয়া উঠিল—আরতীর সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। হরি! হরি! ইন্দুভূষণ কোথায়! দেবালয়স্থ সকলকে দেবীকৃপায় উন্মত্ত করিয়া—সকলের চক্ষে ধুলি দিয়া বৈরাগী ইন্দুভূষণ কোথায় প্রস্থান করিয়াছে।

হলধর প্রকৃতিস্থ হইয়া ইন্দুভূষণকে দেখিতে পাইলেন না—হারানিধি আবার হারাইলেন। দেবালয়ের সকল স্থান অনুসন্ধান করিয়া কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। এতক্ষণে আরতি বন্ধ হইয়াছে, লোকের জনতা কমিয়া আসিয়াছে সেই সুযোগে হলধর ও পুরির কর্ম্মচারীগণ চারিধারে ইন্দুভূষণের অনুসন্ধান লইল, কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না। হলধর চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন, কি বলিয়া মাতা হিন্দোলাকে উত্তর দিবেন? দেওয়ানজীকে কি সমাচার দিবেন? বালক 'রেখা' যখন বাবা! বাবা! বলিয়া অস্থির হইবে,তখন তাহাকে কি বলিয়া শান্ত করিবেন? বালিকা 'চপলা' তাঁহার গলদেশ আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতে ২ যখন বলিবে জ্যা আমার বাবা কোথায়? জ্যা তখন তাহাকে কি বলিয়া শান্তনা করিবেন? ইত্যাদি ভাবনায় অধীর হলধর, আরও অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "হায়! হায়! রত্ন হাতে পাইয়া হস্তস্থ রত্ন হারাইলাম। পাগলিনী হিন্দোলা অতুলৈশ্বর্য্য মধ্যে থাকিয়া ও জন্মদুঃখিনী! মাগো! এমন শান্তদান্ত সাধু স্বামী পাইয়া স্বামী সুখে বঞ্চিত হইলে?"

বনমালী স্বামী হলধরকে অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন "ইন্দুভূষণ ত্যাগী পুরুষ তাঁহার ভোগ সুখ ফুরাইয়াছে আর কেন তাঁহার ভোগ বাসনা হইবে?"

হলধর কহিল "প্রভো! তাই ইন্দুভূষণ কহিয়াছে হলধর ডিম্বে আর কেন প্রবেশ করাইতে চাহ? তবে কি ইন্দুভূষণ আর সংসারী হইবে না?

এজনমের মত তাঁহার সংসার লীলা ফুরাইল—পুতুল খেলা সাঙ্গ হইল?” এই সময় তোরণদ্বার বন্ধ হইল, সেই শব্দে শব্দ মিশাইয়া দূরে ধ্বনিত হইল “পুতুল খেলা সাঙ্গ হইল”।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বহুদিন পরে হলধর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন ক্ষিন্নমনে, নিরাশ হৃদয়ে, মলিন মুখে, হলধর প্রত্যাবৃত্ত হইল। বহু চেষ্টায়, বহু অনুনয় বিনয়ে, বহু সাধ্য সাধনায় ইন্দুভূষণ গৃহে ফিরিল না। স্বামি মহাশয় ইন্দুভূষণকে গৃহে যাইতে অনেক উপদেশ দিলেন, কিন্তু পরম বৈরাগী ইন্দুভূষণের গৃহ ভাল লাগেনা, রাজভোগ ভাল লাগেনা, ঐশ্বর্য্য ভাল লাগেনা, দারাপত্য ভাল লাগেনা। যেন সংসার শ্মশানসম—যেন শূন্যারণ্য—নিভৃত শ্মশান বড়ই প্রীতিকর, বড়ই সুখপ্রদ। সংসারের অলিক ভাবনা, লোকালয়ের কোলাহল, আর ইন্দুভূষণের ভাল লাগেনা। বৈরাগী ইন্দুভূষণ আর সংসারী হইবার উপযুক্ত নহে; সুতরাং রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে ইন্দুভূষণ দেবালয় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় প্রস্থান করিয়াছে। পরদিন হলধর রাজাবাহাদুরের জন্য কতই অপেক্ষা করিল, কত ভাবিল—কত কাঁদিল। শেষে কাঁদিয়া কাটীয়া নিরাশ হৃদয়ে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল, সংবাদ তড়িতের ন্যায় প্রচারিত হইল “রাজাবাবু গৃহে ফিরিবেন না—বৈরাগ্যাবলম্বনে তীর্থে২ পরিভ্রমণ করিতেছেন।”

অর্থগৃধ্নু রাজকর্ম্মচারীগণ এই সংবাদে পরমানন্দিত হইল, এখন অবাধে অর্থাগম হইবে—যাহা অভিলাষ তাহাই করিবেন—কে আর দেখিবে? একা বৃদ্ধ হলধর কয় দিক রক্ষা করিবে?

ধর্ম্মভীরু, রাজসংসারের প্রিয় চিকীর্ষু, হিতৈষী কর্ম্মচারীগণ রাজাবাবুর বিরহে অশনিসম্পাতিত তালবৃক্ষের ন্যায় স্থানুবৎ নির্জ্জীব হইয়া দণ্ডায়মান রহিল মাত্র। দেওয়ানজী নেমকের চাকর, রাজ সংসারে তাঁহার বহুদিন কাটীয়া গেল—রাজাবাবু তাঁহার চক্ষের উপর মানুষ হইল—সেই রাজাবাবু আবার ভোগে বিগতস্পৃহ হইয়া বৈরাগ্যপথাবলম্বী হইলেন। দেওয়ানজীর আর দাসত্ব ভাল লাগিল না। যে রাজ সংসারে চাকরী করিয়া তিনি ধনী হইয়াছেন সে রাজ সংসারের অমঙ্গল দর্শন তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, কিন্তু কি করেন হলধরের অনুরোধে নাবালক রাজপুত্র কন্যাদ্বয়ের মুখ চাহিয়া দেওয়ানজী অনিচ্ছার সহিত রাজ্যভার স্কন্ধে লইলেন।

মূঢ় অকৃতজ্ঞ রমেন্দ্র হলধর কর্তৃক রাজসংসার হইতে তাড়িত হইল। কয়েক দিনের কারাবাস তাহার পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে ভাবিয়া, হলধর রমেন্দ্রকে কারামুক্ত করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে এজনমের জন্য তাড়াইলেন।

হলধর রেখা ও চপলার মুখ চাহিয়া আবার সংসারে বুক বাঁধিল। ইন্দুভূষণের বিরহ সহ্য করিয়া হলধর শিশুবালক বালিকা লইয়া পুতুল খেলা করিতে আবার সংসার পাতিল।

রেখা ও চপলা হলধরকে প্রত্যাগত দেখিয়া মাতার নিকট ছুটীল এবং আনন্দে মাথায় হাত দিয়া নৃত্য করিতে২ কহিল "মা! জ্যা—জ্যা—জ্যা! ঐঃ—ঐঃ জ্যা!"

চপলা রেখাপেক্ষা বয়সে একটু বড় সে কহিল "বা—বা—নেই! জ্যা—এয়েঁ" রেখা সেই সুরে সুর দিয়া কহিল "বা! বা! নেঃ—নেঃ—জ্যা-জ্যা।"

হিন্দোলা সকলই বুঝিল—স্বচক্ষে সকলই দেখিল—তাহার সংসার করা আর এজনমে ঘটীল না—বিধাতা বৈমুখ—পূর্ণ সুখে বাদ সাধিল। হিন্দোলার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল—এজনমের মত সে ও সর্ব্ব সুখে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত

হইয়া হলধরকে ডাকাইল। হলধর হিন্দোলাকে কি বলিবে? কি বলিয়া তাহার সহিত কথা কহিবে? কোন কথায় তাহাকে প্রবোধ দিবে? পাঁচ সাত ভাবিয়া তাই হিন্দোলার সহিত এতক্ষণ কথা কহে নাই—তাই হিন্দোলার নিকট রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করে নাই। যখন হিন্দোলা স্বয়ং তাহাকে ডাকাইল, আর হলধর থাকিতে পারিল না—কাতর ও শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে হিন্দোলার নিকট গমন করিল। পথি মধ্যে বহু প্রাচিনা পরিচারিকা-দিগের সহিত তাহার দেখা হইল। সকলেই তাহাকে রাজাবাবুর সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিল। হলধর স্বভাবতঃ বিশেষ গম্ভীর সুতরাং উচিৎ বিবেচনায় কাহারও প্রশ্নের উত্তর না দিয়া একাইক অন্দরে প্রবিষ্ট হইল। হিন্দোলা শুনিয়াছেন যে হলধর একাই প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন—রাজাবাবু আসেন নাই। হলধর নিকটে আসিবার পূর্ব্বে হিন্দোলা কত কি ভাবিল—আপন মনে কত কি সিদ্ধান্ত করিল—মনে২ কত কথাই কহিল। যদি হলধর ইন্দুভূষণকে না পাইয়াই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে, যদি হলধর ইন্দুভূষণের অশুভ সম্বাদ লইয়া আসিয়া থাকে—যদি ইন্দুভূষণ তাহার স্বভাবের উপর সন্দিহান হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া থাকে—এবং হলধরের সাক্ষাতে সেই কথা যদি প্রকাশ করিয়া থাকে ইত্যাদি নানা বিষয় হিন্দোলার হৃদয়ে উপজিত হইয়া তাহাকে নিতান্ত কাতর করিল। সংশয়ে বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়া হিন্দোলা হলধরকে প্রথম সাক্ষাতে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না। যথার্থ ঘটনা গোপন থাকে না, পুনঃ নিরুদ্দেশবার্ত্তা অন্দরে প্রবিষ্ট হইল। পরিচারিকা মহলে প্রচারিত হইল "হলধর রাজাবাবুর সন্ধান পাইয়াছিলেন কিন্তু ললাটেশ্বরীর পুরি হইতে রাজাবাবু কোথায় সরিয়া পড়িলেন আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া গেলনা"। হিন্দোলা সে কথা শুনিলেন, কিন্তু হলধরের মুখে না শুনিলে সে কথা প্রত্যয় করিলেন না, হলধরের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু আর হলধরের প্রতীক্ষায় বসা হইল না। হিন্দোলার মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল, হলধর যাহা বলিবে তাহা তিনি শুনিতে প্রস্তুত নহেন, শুনিবার ক্ষমতা ও তাঁহার নাই—অতএব হলধরের সহিত সাক্ষৎ করা তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইয়া উঠিল, সুতরাং ধীরে২

হিন্দোলা শয়নকক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন—ধীরে বহুদিন পরে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন—ধীরে২ শয়ন করিয়া পড়িলেন—ধীরে২ কোমল কিশলয় নিন্দিত হস্ত দ্বারা নয়নদ্বয় ও বদনমণ্ডল আচ্ছাদন করিলেন—এবার নয়নে নীরবে বারি ধারা বহিল—নয়নাশ্রু বক্ষ প্লাবিত করিল—আর শয়ন করা হইল না—হলধর কি অশুভবার্ত্তা তাঁহাকে শোনাইবে—সে কথা হিন্দোলা শুনিয়া সহ্য করিতে পারিবে না—তাঁহার জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ, হৃদয় সর্ব্বস্ব ইন্দুভূষণের অশুভবার্ত্তা শুনিতে হিন্দোলা প্রস্তুত নহে। হলধর ও এদিকে রাজবাবুর সন্ন্যাসাবলম্বনের কথা—তাঁহার পুনর্নিরুদ্দেশবার্ত্তা হিন্দোলাকে শোনাইতে প্রস্তুত নহে—হলধর ব্যাকুল ও নিতান্ত কাতর। যে দিন হলধর রাজবাটী পহুঁছিলেন সে দিন কাটীয়া গেল রাণীমার সহিত সাক্ষাৎ করা হইল না—পরদিন হিন্দোলার সহিত সাক্ষাৎ করিল মাত্র কিন্তু বাঙনিস্পত্তি করিতে পারিল না—সাক্ষাতে উভয়ে নীরবে রহিল—হলধরের নয়নাশ্রু সকল ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিল—বাঙনিস্পত্তির অবসর রহিল না। ইহার দু একদিন পরে হিন্দোলা তীর্থ যাত্রায় প্রস্তুত হইয়া হলধরের হস্তে সকল ভার অর্পণ করিয়া শিশু বালক বালিকার ভার অবধি অর্পণ করিয়া দু একটী লোক সমভিব্যাহারে লইয়া গোপনে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এই তো পুণ্যক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবন,—এই খানেই তো সদ্যপ্রসূত শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব কর্ত্তৃক আনীত হইয়া নন্দালয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছিল,—এই তো শ্রীকৃষ্ণের বাল-লীলা ভূমি—ঐ তো খরতরপ্রবাহ-মানা কালিন্দি যমুনা—এই তো সেই গোবর্দ্ধন গিরি—বালক শ্রীকৃষ্ণ যাহা স্বহস্তে উত্তোলন করিয়া সহস্র গোপিনীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন—এই সেই যমুনা তীরে কেলি-কদম্ব বৃক্ষ—ইহারই মূলে মুরলীধর মুরলীবাদনে গোপিনীগণের জীবন ধন হরণ করিতেন। মুরলী "মনোহরং কলং" মহামন্ত্র বাদন করিত—অমনি গোপিনীগণ সংসার ভুলিয়া—রমণী, স্বামী ভুলিয়া, পুত্র ভুলিয়া,—সংসার ভাসাইয়া দিয়া—গোপ বালক সংসার ছাড়িয়া দিয়া শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণময় দেখিত। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর না হইলে সংসার ভুলে কিসে? ঐ অদূরে শ্রীকৃষ্ণের লীলাময়ী, শাল, তাল, তমাল, বনরাজির নিকুঞ্জ, ঐ স্থানে পূর্ণ প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়ী রাধাসনে প্রেম-লীলা সাঙ্গ করিয়াছিলেন। পরপারে মথুরাপুরী কংস রাজ্য। কলুষ-পূর্ণ মায়াময় সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর গতি নাই। কংস শব্দে ঘোর মায়ামোহ বিজড়িত সংসারী ব্যক্তি। তাই শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণময় জীবন বসুদেব দেবকীকে সংসার রূপ ঘোর মহামায়াপাশ ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন।

ইন্দুভূষণ সংসার ছাড়িয়া—রাজ্য ছাড়িয়া—ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া—প্রাণ সম-প্রিয়তমা হিন্দোলা ছাড়িয়া—ননীর পুতলি সংসার বন্ধনের তন্তী স্বরূপ রেখা চপলা ছাড়িয়া সেই মধুর বৃন্দাবনে সমাগত। এখানে শোক তাপ নাই—

সংসার চিন্তা নাই—মায়া মমতা নাই—কোন ভাবনাই নাই, এই পবিত্র শ্রীবৃন্দাবনে যমুনা তীরে তমাল বনে পর্ণকুটীর রচনা করিয়া ইন্দুভূষণ বৈরাগী-বেশে ভিক্ষালব্ধ অর্থে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। ছলনাময় হরি এ অবস্থায় ও ইন্দুভূষণকে ছলনা করিতে ভুলিলেন না। ধার্ম্মিককে ছলনা শ্রীহরির ব্যবসায়। তুমিই না দানশীল বলিকে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষাচ্ছলে ছলনা করিয়াছিলে? ছলনা করিয়া বদান্য কর্ণকে স্বহস্তে প্রাণসম পুত্র বধ করাইয়া তাহার কোমল মাংস আহার করিয়াছিলে—ছলনা করিয়া নন্দকে নিরানন্দ সাগরে ভাসাইয়াছিলে—ছলে মধুকৈটভ বধ করিয়াছিলে—দৈত্য নিসূদন! কতবার কত লীলায় কত দৈত্য ছলে কৌশলে বিনাশ করিয়াছ? সর্ব্বত্যাগী ইন্দুভূষণ আজ ছলনাময়ের সেই ছলনায় পতিত।

স্বীয় পর্ণ কুটীর পার্শ্বে পবিত্র তুলসি বৃক্ষ রোপন মানসে ইন্দুভূষণ একদা লৌহ নিড়ান দ্বারা ভূমি উৎকর্ষণ করিতেছিলেন, সহসা একটী প্রস্তর সংযোগে লৌহ নিড়ানি সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল। আহা! কি আশ্চর্য্য! বৃন্দাবনের বিজন বনেও পরেশমণির অবস্থান! বিপুল ধনৈশ্বর্য্যত্যাগীর, দারা-পত্য-ত্যাগীর নিকট পরেশমণি কি ছার! হরি হে যে সর্ব্বত্যাগী হইয়া তোমারি ভিখারি, সে কি পরেশমণির প্রত্যাসী? লৌহ নিড়ান সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল দেখিয়া ইন্দুভূষণ সেই নিড়ানটী হস্তে লইলেন এবং অপর হস্তে পরেশমণি ধারণ করিয়া যমুনোপকূলে গমন পূর্ব্বক যমুনাকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন "যমুনে! তুমি এই গোকুল বেষ্টন করিয়া আবহমানকাল বহমানা। তোমার তীরভূমি শ্রীকৃষ্ণের বাললীলাক্ষেত্র, তুমি শ্রীহরিকে বক্ষে ধারণ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছ! কদম্ব মূলে যুগল মূর্ত্তির অবস্থান কালে তাহার ছায়া অপহরণ করিয়া আপন অঙ্গে মিশাইয়াছ! আমি অকিঞ্চন! স্বয়ং হরিকে তো পাইলাম না—তাঁহারই পদাঙ্কিত ভূমিতে বাস করিয়া তোমার কাল জলে অবগাহন করিয়া পাপ জীবনের সার্থক করিতেছি। ইহাতেও শ্রীকৃষ্ণ ভাগ্য দোষে বাম—এখানেও ধনরত্নে আমাকে ভুলাইবার বাসনা? হরি হে! আমি কি এত নরাধম! পূর্ব্ব জন্মে আমি কি এত দুষ্কৃতি করিয়াছি যে তাহার আর খণ্ডন হয় না?

অন্তর্য্যামিন্! আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের তমসাচ্ছাদিত আঁধারময় স্থানও কি তোমার অবিদিত নহে? তুমি দেহের সূর্য্যস্বরূপ, তাহাতে ও কি আমার হৃদয়ভাব তোমার নিকট অপ্রকাশ? অতুলৈশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া—দারাপত্য সংসার সুখে পরম সুখি হইয়াও সে সুখে আমার সুখবোধ হইল না—আমার তৃপ্তি হইল না—অবাধে তাহা ত্যাগ করিলাম। তবে কেন দয়াময় আবার ধনরত্ন লইয়া আমাকে ছলনা? আমি রত্নালঙ্কার চাহি না—ভোগৈশ্বর্য্য চাহি না—কামনা ত্যাগ করিয়াছি—নহিলে তোমায় পাব কিসে? দীনের দীন না হইলে তোমায় পাব কিসে? দীন দয়াল! তুমি কর্ত্তরের—যত্নের—যোগের ধন? যোগীর অমূল্যনিধি। কালাচাঁদ! ছলনা ছাড়িয়া এই তোমার প্রিয় কদম্ব মূলে বাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়া বংশীবাদন করিয়া অভাগাকে চরিতার্থ কর? তোমার স্বরূপ রূপ নিরখিয়া ইহ জীবন সার্থক করি! নয়ন মন চরিতার্থ করি! এতো তোমার লীলাভূমি বৃন্দাবন—একবার বাল্যলীলা স্থানে পুনরাবির্ভাব হইয়া অধমকে কৃতার্থ কর?" এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে ইন্দুভূষণের নয়নযুগলে দরবিগলিত ধারা বহিল। ইন্দুভূষণ সংজ্ঞা হারাইলেন। পবিত্র বৃন্দাবনের কদম্ব মূলে বিগত জ্ঞান ইন্দুভূষণ কতক্ষণ পড়িয়া রহিলেন—যমুনার স্নিগ্ধ সমীরণে ও সুমধুর ব্রজবুলিতে তাঁহার মোহ অপনীত হইল। সে রাত্র সেই কদম্ব মূলেই কাটাল। পরদিন নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে ইন্দুভূষণ গভীর যোগে মগ্ন হইলেন। একদিন ইন্দুভূষণ স্বীয় পর্ণকুটীরের সন্নিহিত পুষ্প বাটীকা পরিষ্কার করিতেছেন ইত্যবসরে একটী ভূগর্ত্তে বহু সুবর্ণ প্রোথিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। সুবর্ণ স্পর্শ মাত্র তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিকলাঙ্গ হইল। বহু ক্লেশে আবার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি স্বভাবত্ব প্রাপ্ত হইল। ইন্দুভূষণ এক্ষণে পরম যোগী, পূর্ব্ব স্মৃতি তাঁহার এক্ষণে স্বপ্নবৎ—সংসার স্বপ্নবৎ—কামনাদি বিবর্জ্জিত—পূর্ণ জ্ঞান হৃদয়ে বিকশিত হইয়া অহর্নিশি পরমানন্দে বিভোর! নিদ্রা নাই—সুষুপ্তি নাই—আহার প্রায় নাই বলিলেই হয়—দেহ শীর্ণ—মলিন—রজনীতে ইন্দুভূষণ কুটীরাভ্যন্তরে অতি অল্প সময় কম্বলাসনে বিশ্রাম করেন। দিবাভাগে কুটীরের বহির্দ্দেশে যোগপীঠে যোগাসনে সমাসীন থাকেন।

একদা ইন্দুভূষণ শ্রীকৃষ্ণের বনলীলা ভূমি পর্য্যটন করিয়া অতি অপরাহ্ণে কুটীরে প্রত্যাগত হন। পথশ্রমে ও শরীরের ক্লান্তি বশতঃ এবং শয্যা রচনা অপেক্ষাকৃত প্রশস্থ ও সুকোমল হওয়ায় কীটশূন্য শয্যায় শয়ন করিবামাত্রই ইন্দুভূষণ গাঢ়-নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। সে রাত্রে আর তাঁহার ভগবান চিন্তা হইল না। যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল সে সময় সূর্য্যদেব আরক্তিম গগণে উদিত হইয়াছেন—নবীন রবির হেমাভকিরণ যমুনার কালজলে পতিত হইয়া কালিন্দীর কাল জল সুবর্ণরঞ্জিত করিযাছে—সুমন্দ প্রভাত বায়ু সঞ্চারিত হইয়া যমুনা জল সহ কেলি করিতেছে। ঈষদ্বিক্ষিপ্ত সুবর্ণ-রঞ্জিত বীচি-মালা বাত্যা-তাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। যমুনা তীরস্থিত বৃক্ষমূলে পাখীকুল সুমধুর হরিগুণ গান করিয়া বনস্থলি মাতাইতেছে। কাচিৎ হরিণীগণ শাবকদল সহ নির্ভিক চিত্তে ইতঃস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। দিবাভাগে নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় ইন্দুভূষণ নিতান্ত বিমনা হইয়াছেন, কারণ আজ তাঁহার প্রভাতীয় নিত্য ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মিয়াছে, রজনীতে দেব চিন্তার ক্রটী হইয়াছে। এরূপ ব্যাঘাতের কারণ ইন্দুভূষণ কিছুই বুঝিলেন না—তাঁহাতে কি পাপ স্পর্শ হইয়াছে যে দেবতা তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন? সর্ব্বত্যাগী হইয়াও তাঁহার কি ক্রটী সঞ্জাত হইল? কামিনী-কাঞ্চনত্যাগীর প্রত্যবায় কি হইতে পারে? তাঁহার সঙ্কল্প ও নাই সমাপ্তিও নাই, তবে কেন এরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়? ইন্দুভূষণ ভাবিয়াই আকুল। স্থির সাগরে লোষ্ট্র নিক্ষেপবৎ ইন্দুভূষণের প্রশান্তচিত্ত দারুণ চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিল।

তাঁহার ধনাশা নাই—ভোগাশা নাই—লালসা নাই—বাসনা নাই—তবে কেন এ ছলনা? ইন্দুভূষণ কহিলেন "ছলনাময় আবার ছলনা কেন? কতবার আমায় এরূপ ছলনা করিবে? বার বার ছলনা করিয়া কি আমার পরীক্ষার শেষ হইল না? ভগবান! তবে কি এ জীবনে পরীক্ষার শেষ হইবে না? এ অভাগা কি তোমার স্বরূপ রূপ ইহ-জীবনে দেখিতে পাইবেনা—এ জীবন তবে কি বৃথায় অতিপাত হইবে? মধুসূদন! আমি তোমারই জন্য ব্যাকুল—ধন চাহি না—মান চাহি না—ভোগ্যবিলাস নাই—কোন কামনাই আমার নাই—আমি

কেবল তোমা-ধনের ভিখারী। হরি হে! একবার তেম্‌নি করে বাঁকা হয়ে কদম্ব-মূলে বংশী হস্তে দাঁড়াও আমি সচন্দন কুসুমে তোমার যুগল চরণ পূজা করিয়া নয়ন ও মন সার্থক করি।"

সে দিবস ইন্দুভূষণের এইরূপ শোকেই কাটীল। পুনঃ রজনী সমাগত হইলে ইন্দুভূষণ পর্ণ কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবানের নাম জপ করিতেছেন, ইত্যবসরে একটী যুবতী তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার পর্ণ কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার চরণ সেবায় নিযুক্ত হইল। বহুদিন পরে কোমলাঙ্গীর কোমল কর-স্পর্শে সন্ন্যাসী বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী ইন্দুভূষণের ও অঙ্গ শিহরিল, হরিনাম জপ ভুলিয়া গেলেন, উভয়ে কতক্ষণ নীরব রহিলেন—কে বলিবে কতক্ষণ নীরব রহিলেন? নীরবে কোমলাঙ্গীর বিকচ নয়নযুগল হইতে এক বিন্দু উষ্ণ অশ্রু-বারি নির্গত হইয়া গণ্ড বাহিয়া ইন্দুভূষণের চরণে পতিত হইল—ইন্দুভূষণ আরও শিহরিলেন—অপরিচিতা সুন্দরী ক্রন্দন করিতেছে ইহা ভাবিয়া লইলেন—কতক্ষণ পরে সুন্দরীর অশ্রুসিক্ত কণ্ঠ হইতে ভগ্নস্বরে কথিত হইল, "নাথ! অভাগিনী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুসারিণী হইয়াছে, ধর্ম্ম পত্নীকে ধর্ম্মকার্য্যে ত্যাগ করিলে তরুহীন ছায়ার ন্যায় বিনষ্ট হইবে?"

এতক্ষণে ইন্দুভূষণ সকলি বুঝিলেন। বুঝিলেন আবার মহামায়ার ছলনা। ঈষদ্গাম্ভীর ভাবে কহিলেন "হিন্দোলা! সকলই তো রাখিয়া আসিয়াছি, সঙ্গে কায়ামাত্র অবশিষ্ট আছে অতএব তদনুসরণে ফল কি? সুন্দরী রোদন স্বরে উত্তর করিল "হিন্দোলা ধন চাহে না—ঐশ্বর্য্য চাহে না—সুখাভিলাষিণী নহে —সে কেবল এই চরণ প্রান্তের আশ্রয় ভিখারিণী। এতদিন রেখা চপলার মুখ চাহিয়া সংসারে ছিল মাত্র; আপনাকে ভুলে নাই, অহর্নিশি আপনার পাদুকা মস্তকে রাখিয়া আপনারি চরণ চিন্তা করিত।" পাঠক এই অপরিচিতা যুবতী আমাদের চিরদুঃখিনী হিন্দোলা। হিন্দোলা বহু অনুসন্ধানের পর বহুদিন পরে জীবনের একমাত্র অবলম্বন স্বামী সন্দর্শন পাইয়া সহসা যে কিরূপে প্রথম বাক্যালাপ করিতে সমর্থ হইল ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্য। বহু আনন্দে, মুখ, ফোটে—ফোটে—ফোটেনা। কিয়ৎ পরিমাণে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইলে তবে

বাক্-স্ফূর্ত্তি হয়। হিন্দোলা স্বামী চিন্তায় জীর্ণা শীর্ণা মলিনা কঙ্কালমাত্রাবশিষ্টা। অপ্রতিহত বিরহাবচ্ছেদে সুখসম্মিলন ও প্রাণাত্যয়কর। কিরূপে হিন্দোলা তবে স্বামীর প্রথম দর্শনে এরূপ সংলগ্ন ভাবে কথা কহিতে সমর্থা হইয়াছিল? একদিনে নহে। প্রথমে দূর হইতে স্বামী দর্শনে হিন্দোলা মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন, কোন বন্ধুর সাহায্যে মূর্চ্ছাপনোদনান্তে তাঁহার আশ্রয়ে রক্ষিতা হইয়াছিলেন; ইন্দুভূষণ তদ্বিষয়ে পূর্ণান ভিজ্ঞ ছিলেন। আর এক দিবস হিন্দোলা ইন্দুভূষণের অজ্ঞাতসারে তাঁহার পর্ণকুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার পূর্ব্বাপর অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। সেদিনও সেই বন্ধুর সাহায্যে হিন্দোলা ইন্দুভূষণের আগমনের পূর্ব্বেই প্রকৃতিস্থা হইয়া অপসৃতা হন। সে দিবসও ইন্দুভূষণ ঐ বিষয় অপরিজ্ঞাত ছিলেন।

তৃতীয় দিবস সেই পরম বন্ধুর সাহায্যে হিন্দোলা অতি গভীর রাত্রে বহির্গত হইয়া ইন্দুভূষণের কুটীরোদ্দেশে গমন করিয়া কুটীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঘোর নিদ্রাভিভূত ইন্দুভূষণের পদসেবা করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু পদস্পর্শে হিন্দোলার চৈতন্যাপনীত হয়। জ্ঞানোদয়ে দেখে সে, সেই পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুর আবাসে তাঁহারই কোলে অবস্থান করিতেছে। মূর্চ্ছিতাবস্থায় হিন্দোলা এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিল যেন, একটী অপূর্ব্ব উদ্যানে হিন্দোলা প্রবেশ করিলেন; এরূপ মনোরম উপবন হিন্দোলা আর কখন দেখে নাই। সূর্য্যদেব উদিত হয় নাই, অথচ চন্দ্রের স্নিগ্ধ-জ্যোতিতে উপবন আলোকিত—চন্দ্রমার ক্ষয় বৃদ্ধি নাই—সদাই পৌর্ণমাসী—তরুরাজি মনোহর চির প্রস্ফুটিত কুসুমরাজিতে সুশোভিত—সে কুসুম সৌন্দর্য্য অব্যাহত,—তাহার সৌগন্ধ যেন অপ্রতিহত—ফলবান তরু সুপক্ক ফল ভরে অবনত—ময়ূর ময়ূরী কেকারবে বনস্থলি মাতাইয়া প্রতিনিয়ত নৃত্য করিতেছে—পাখীকুল সুমধুর স্বরে কূজন করিতেছে, মরি মরি! যেন হিন্দোলা নন্দনবনে প্রবিষ্টা।

স্বপ্নে অনুমিত হয়, যেন স্বর্গ সম প্রদেশে হিন্দোলা সমাগত, অথচ এই বৃন্দাবনের দৃশ্যাবলি তথায় বিরাজিত। সেই [illegible] তমালতালি বনরাজি নীলা—সেই মনোহর পাখীকুল কূজিত কুঞ্জবন শ্রেণী—পারিজাত বৃক্ষসদৃশ সেই

কদম্ববৃক্ষ—সেই বিস্তৃত গোষ্ঠ পঙ্ক্তি—খরতর প্রবাহমানা পূততোয়া মন্দাকিনী সদৃশা সেই কৃষ্ণকায়া যমুনা, গোকুল বেষ্টিয়া বহমানা—ময়ুর ময়ুরী আনন্দে-নির্ভয়ে সেই সুখ উপবনে নৃত্য করিতেছে—হরিণদল শাবক সহ শ্বাপদ সঙ্কুল বনে নিরাতঙ্কে চরিয়া বেড়াইতেছে। সেখানে হিংসা নাই—দ্বেষ নাই—বনস্থলী যেন আনন্দময়—যেন মর্ত্ত্যে স্বর্গধাম। হিন্দোলা একমনে সেই মনোরম দৃশ্য দেখিতেছে ও দেখিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে হিন্দোলা দেখিল যেন সেই বিশাল বনস্থলী এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃতে বিভাসিত হইল। সেই জ্যোতির্ম্মধ্যে এক অপূর্ব্ব পুরুষ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল—জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ! শান্ত—দান্ত—আনন্দময় মূর্ত্তি। হরি! হরি! হিন্দোলা দেখিল সে ইন্দুভূষণের মূর্ত্তি—পরক্ষণেই দেখিল দীনা-হীনা মলিনা এক রমণী, জ্যোতির্ম্ময় রূপধারী ইন্দুভূষণের পদ সেবায় নিযুক্তা—সে রমণী অন্য কেহ নহে, হিন্দোলা স্বয়ং। আর সে মূর্ত্তি নাই! সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে আর ইন্দুভূষণ লক্ষিত হইতেছে না! যেন এক অপূর্ব্ব বালক মূর্ত্তি কদম্ব মূলে মুরলী হস্তে ত্রিভঙ্গ হইয়া দণ্ডায়মান। সহসা হিন্দোলার সেই সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল—নিদ্রাভঙ্গে হিন্দোলা চকিত ভাবে চক্ষুরুন্মিলন করিলেন। স্বপ্নের স্থূল মর্ম্ম হিন্দোলা এই বুঝিল, যেন তাহার স্বামী আর মানুষ নহেন দৈবতা হইয়াছেন—তাহাতে হিন্দোলার বড়ই সুখ হইল। সুখ দোলায় দোদুল্যমান রাজোপাধিতে ভূষিত স্বামীকে সন্দর্শন করিয়া হিন্দোলার তত সুখ হইত না। আজ হিন্দোলা ভিখারিণী বেশে স্বামী সেবানুরতা হইয়া যেরূপ আনন্দ উপলব্ধি করিতেছে, সুখৈশ্বর্য্যে পরিমণ্ডিত, দাস দাসী পরিবেষ্টিত থাকিলে আজ হিন্দোলার এরূপ আনন্দ হইত না, হিন্দোলা ইন্দুভূষণের সহিত উন্মত্তবৎ কথা কহিয়া নীরব রহিলেন। ইন্দুভূষণ উত্তর করিল "ভার্য্যা ভরণীয়া—ভরণপোষণের তো অপ্রতুল নাই—ধর্ম্মপত্নী স্বামীর ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যাঘাৎ জন্মান না। তুমি পুত্র কন্যা লইয়া বিষয় বৈভব লইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন কর? পরকালে মুক্তি হইবে।"

হিন্দোলা। ধর্ম্মপত্নী স্বামীর সহিত ধর্ম্ম সাধনা করিবে, ধর্ম্ম কার্য্যে তাঁহার সহায় হইবে, যৌবনে স্বামী সহবাসই শাস্ত্র সম্মত। কেন আমি

ব্যাভিচারিণীর ন্যায় স্বামী সহ স্বতন্ত্র থাকিব ? অতএব ও আদেশ করিবেন না।"

ইন্দুভূষণ। "আমি কাহারও স্বামি নহি, কেহ আমার স্ত্রী নহে—একা আসিয়াছি স্বীয় কার্য্যসাধন করিয়া একাই যাইব। অতএব আমায় ত্যাগ কর ?"

হিন্দোলা। "হারানিধি পাইয়া কে কোথায় ত্যাগ করে ? অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া আমায় বিবাহ করিয়াছেন, অতএব আপনাকে আর ছাড়িয়া যাইব না।"

ইন্দুভূষণ। "তবে কি আমার সঙ্গে থাকিয়া এমন পবিত্র বৃন্দাবনেও আমার সাধনার ব্যাঘাত জন্মাইবে ?"

হিন্দোলা। "আপনার কিছুতেই বিঘ্ন জন্মাইতে আসি নাই। আপনার চরণসেবা সঙ্গী করিতে আসিয়াছি—আপনার সাধনার সাহায্য করিতে আসিয়াছি।"

ইন্দুভূষণ। "অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিলেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, কিন্তু পূর্ব্বাভ্যাসের স্মরণ চিহ্ন সম্মুখে বিদ্যমান থাকিলে চিত্ত পুনঃ প্রবৃত্তি মার্গে ধাবিত হইতে পারে। অতএব আমাকে শীঘ্র ত্যাগ কর ?"

হিন্দোলা। "আপনি আমার স্বামী—আমার দেবতা—ইহকালের ভোগ সম্পূর্ণ সম্ভোগ করিয়াছি—আপনার প্রসাদে সুখৈশ্বর্য্যের বাকি নাই—এক্ষণে সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ স্বামীর চরণ সেবা করিয়া জীবনের শেষ ভাগ কাটাইব।"

ইন্দুভূষণ। "স্বামী স্ত্রীর দেবতা সত্য, কিন্তু স্ত্রীর সহিত একত্র সহবাস গৃহীর পক্ষে—ত্যাগীর পক্ষে নহে। রমণী সাধনার প্রধান অন্তরায়। বাসনা ত্যাগই সাধনা, কামিনী কাঞ্চনে, বাসনার পূর্ণাবির্ভাব, সুতরাং রমণী সাধকের পক্ষে অগ্রেই ত্যাজ্য।"

হিন্দোলা। "পরম যোগী শিব কি সাধনার সময় পূর্ণ প্রকৃতি মহামায়া স্বরূপিনী দুর্গাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন ? মহাশ্মশানে মহাযোগে মগ্ন, সেখানেও আদ্যাশক্তি মহাশিবের বক্ষে চরণদ্বয় স্থাপন করিয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক বরাভয় দান করিতেছেন।

ইন্দুভূষণ। "সাধক যখন যোগ প্রভাবে শিবত্ব প্রাপ্ত হইবে, তখনই পরম-প্রকৃতি স্বরূপা শক্তি পরম পুরুষ রূপ সাধকের সহিত বিজড়িত হইবে। তৎপূর্ব্বে নহে।"

হিন্দোলা। "কৃপা করিয়া—দয়া করিয়া—দাসী বলিয়া—অকিঞ্চন বলিয়া—চরণে স্থান দিন—ত্যাগ করিবেন না—মোহান্ধে নিক্ষেপ করিবেন না।"

ইন্দুভূষণ। "কে কাহার ত্যজ্য, কেইবা কাহার গ্রাহ্য? সকলই ধোঁকার টাটী। এক হইতে আসিয়া একে মিশিতে হইবে। দেরি না হয়, যত শীঘ্র মেশা যায় ততই ভাল। আর বিলম্ব কেন? অবসর দাও—অবসর দাও—অগ্রসর হইবার অবসর দাও?"

হিন্দোলা। "যখন ধরিয়াছি ছাড়িব না। আমি দাস দাসী চাহি না—ধন চাহি না—অলঙ্কার চাহি না—পুত্র কন্যা চাহি না—তোমারই সব—তোমারই ঘরে রহিল—যে তাহা ভালবাসে তাহাকে দিন—সে লইয়া ভোগ করুক—আমার আর ভোগাভিলাস নাই—তোমাকে পাইয়াছি, আর কিছুই চাহি না—তোমারই সঙ্গে তোমারই গন্তব্য পথে যাইব। চরণে ধরি অভাগিনীকে নিরাশ্রয়ে ফেলিয়া যাইবেন না।"

ইন্দুভূষণ। "বহু চেষ্টায় পথে আসিযাছি, আর পথ ভ্রষ্ট করিও না? মন মারিয়াছি আর বাঁচাইও না? রমণী জননী, অতএব তোমা হইতেই জন্মিয়া এ দুর্ব্বিসহ বিষয় ভার বহন করিতেছি, আর যেন পুনরায় জন্মাইতে না হয়? রমণীকে স্ত্রীভাবে গ্রহণ করিলে আবার জন্মাইতে হইবে। আর ভোগ করিতে পারি না—মুক্তি! মুক্তি! চির শান্তি! চির শান্তি! চির শান্তি লাভই সঙ্কল্প।"

হিন্দোলা। "নাথ! আমিও শান্তি পথাবলম্বিনী—চির শান্তি ভিখারিণী—তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমারই চরণ যুগলধ্যায়িনী—মোহান্ধকে ছাড়িও না—পথহারা—দিশাহারা—অনাথিনী মারা যাইবে—এ সংসারে হিন্দোলাকে কে আর পথ দেখাইবে?"

ইন্দুভূষণ। "ছাড়িবে না? ছাড়িবে না? তবে আমায় ভজনা কর? এই কথা বলিতে বলিতে উন্মত্তবৎ—ক্ষিপ্তবৎ কহিতে লাগিল "কে

মা! আনন্দময়ি! মহাশ্মশান মাঝে নৃত্য করিতেছ? হাসিয়া, হাসিয়া, ভুবন চমকিয়া প্রাণ মাতাইয়া—জীবন শিহরিয়া দিয়া—নৃত্য করিতেছ! কৈ? কৈ? বুক পাতিয়াছি, নৃত্য কর? (হিন্দোলার চরণ ধারণ করিয়া) কৈ মা!—ভুবন মোহিনি! নয়ন ভরিয়া দেখি মা? একি! মা যে আমার অঙ্গে মিশিয়া গেল? আমিও যে মা হইলাম! বাবাও যে আমার অঙ্গে মিশিল—আমিও যে বাবা হইলাম! আমি যে জগতময়—আমা ছাড়া যে কিছু নয়! সোহহং!”

দেখিতে দেখিতে ইন্দুভূষণের সাধক মূর্ত্তি বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিল—নয়ন-জ্যোতিঃ অতি তীব্র হইল—বদন মণ্ডল নিতান্ত বিকট ভাব ধারণ করিল—পরক্ষণেই নয়ন মুদিয়া আসিল—অঙ্গ স্থির হইল—দন্তে দন্ত পড়িয়া গেল—ওষ্ঠে ওষ্ঠ লাগিয়া গেল; হিন্দোলা সে মূর্ত্তির দিকে চাহিতে পারিল না—যেন দগ্ধ হইতে লাগিল—কোমলাঙ্গী হিন্দোলা ঝলসিত হইল—সে দৃশ্য তাহার সহ্য হইল না। [illegible] ময় বিরাট মূর্ত্তি দেখিল। হিন্দোলা মূর্চ্ছিতা হইল—ইন্দুভূষণ পরম সমাধিতে মগ্ন হইলেন—অন্তরীক্ষে পুষ্প বৃষ্টি হইল।

সম্পূর্ণ।